কায়কল্প

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
প্রণীত

[বিনয়কৃষ্ণ বসু-চিত্রিত]

রঞ্জন ঘোষাল
৩৫ বাদুড়বাগান রো, কলিকাতা
১৩৫১

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

অতঃ কিম্, কায়কল্প, চৈতালী, নীলাঙ্গুরীয়, রাণুর কথামালা, রাণুর প্রথম ভাগ, রাণুর দ্বিতীয়ভাগ, রাণুর তৃতীয়ভাগ, বর্ষায়, কাছে, বিয়ের ফুলদানী, স্বর্গাদপি গরীয়সী, নৈবেদ্য

—কায়কল্প—

প্রথম সংস্করণ : কার্তিক ১৩৫

[তিন টাকা

প্রকাশক : শ্রীরমেশকুমার ঘোষাল, ১-এ, আমহার্স্ট বাগান রো, কলিকাতা
মুদ্রাকর : শ্রীশশধর চক্রবর্তী, কালিকা প্রেস লিঃ, ২৫ ডি-এল্-রায় স্ট্রীট, কলিকাতা

বইখানি সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত রঞ্জিন হালদার মহাশয়কে

সমর্পণ করি

ব.

গল্প

	পৃষ্ঠা
কায়কম	১
ফুটবল লীগ	১১
আর্ট	২২
গণ্পদের বিপদ	৩২
বিড়ম্বনা	৪৬
দাদুর মমতা	৫৪
আস্তিক	৬৭
কাণ্ডের গতিঃ	৭৫
লেখক	৮৬
ভক্ত	৯৩
বালিকা	১১১

কায়কল্পে

প্রায় সাড়ে-আটটা হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তারাপদ, সুধেন— এরা সব উঠিতে যাইতেছিল, বৃষ্টির জন্ত আটকাইয়া গেল। আর এক চোট চা আনিবার জন্ত ভিতরে বলিয়া দিলাম।

তাস আর জমিল না। চা সুরু হইলে চায়ের পথে সাহিত্য আসিয়া হাজির হইল, এবং তারাপদ আধুনিক সাহিত্যকে একটু ঘা দিতেই সুধেন-প্রমুখ কয়েকজন এমন তীব্র প্রতিবাদ সুরু করিয়া দিল যে, অচিরেই ঘরের হাওয়াটা উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। শীতের সঙ্গে বৃষ্টি মিলিয়া যে দারুণ অবস্থাটা সৃষ্টি হইয়াছিল, সেটা অনেকটা কাটিয়া গেল।

তর্ক খুব জমিয়া উঠিয়াছে, মাঘের কন্‌কনানির উপর এই বৃষ্টির রগানের কথা আমরা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি, এমন সময় রাস্তার দিকের দরজাটা একটু খুলিয়া গেল, এবং এক ঝলক সুতীক্ষ্ণ হাওয়া এবং বৃষ্টির ছাটের সঙ্গে ছাতা মুড়িতে মুড়িতে অবিনাশ-ঠাকুরদা প্রবেশ করিলেন। আমরা প্রায় সকলেই বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিয়া উঠিলাম, "ঠাকুরদা, এ-দুর্যোগের মধ্যে যে—এত রাত্তিরে?"

ঠাকুরদা হিহি করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আমাদের মুখের দিকে চাহিলেন মাত্র, কোন উত্তর দিলেন না। দুয়ারটা সম্পূর্ণ খুলিয়া গিয়া বাতাস ও বৃষ্টি জোরে প্রবেশ করিতে লাগিল, ওদিকে ছাতার জলও ঘরের মেঝেয় একখানি রুটির আকারে জমিয়া উঠিল। মনে হইল, কোন কারণে ঠাকুরদা আসিয়াই যেন অপ্রতিভ হইয়া গেছেন। উঠিয়া দুয়ারটা আবার বন্ধ করিয়া তাঁহার হাতের ছাতাটা লইয়া একটা কোণে রাখিয়া দিলাম। অবিনাশ-ঠাকুরদার একটু সংবিৎ হইল, আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "না, এখানে আসি নি,—তোমার গিয়ে, স্বরূপের কাছে গেছলাম। মনে করলাম, একবার দাঁড়িয়ে যাই এখানে—বৃষ্টিটা বড় জোর পড়ছে কিনা।"

বুঝিলাম, স্বরূপ স্যাকরার ওখানে যাওয়ার কথাটা মিথ্যা, ঠাকুরদাকে বানাইয়া বলিতে হইয়াছে। আলনা হইতে তোয়ালে দিয়া বলিলাম, "ভালোই করেছেন, হাত-পাগুলো একটু মুছে নিন শীগ্‌গির। চায়ের কথা বলে দিই ঠাকুরদা, আপনি ঐ ইজিচেয়ারে গুটিয়ে-সুটিয়ে বসুন, বৃষ্টিটা ধরুক একটু···আগে আপনাকে তামাক দিক্।"

চাকরটাকে ডাকিয়া বলিয়া দিলাম।

আবার আধুনিক সাহিত্যের কথা তুলিবার চেষ্টা করা গেল; কিন্তু আর সে-উত্তাপ আনা গেল না। সকলেই বুঝিতেছিলাম, অবিনাশ-ঠাকুরদা এইখানেই কোন একটা কাজে আসিয়াছেন, এবং কাজটা খুব প্রয়োজনীয় ও অল্পবিস্তর গোপনীয় বলিয়া, আসার জন্য এই সময়টি বাছিয়া লইয়াছেন। তিনি এমন একটি জমাট আড্ডা এখানে আজ মোটেই আশা করেন নাই। এমন রাত্রে বাহির হওয়ার মধ্যে যে একটা অদ্ভুত কৌতুকাবহতা আছে, তাহার জন্য অপ্রতিভ হইয়া গেছেন।

চা আসিল, তামাক আসিল, বৃদ্ধ কিন্তু সংকোচটা কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না যেন। আমাদের আধুনিক সাহিত্যও ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া পড়িল। একে একে সবাই উঠিয়া পড়িল।

তখন অবস্থাটা আরও অস্বস্তিকর হইয়া উঠিল। অনেক প্রশ্ন, অথচ একটিও করা যাইতেছে না। চৌকির শতরঞ্জির উপর নখ দিয়া অনন্ত হিজিবিজি কাটিয়া চলিয়াছি, ওদিকে ঠাকুরদার তামাক টানা ক্রমেই অধিকতর সঘন হইতেছে; বেশ বুঝা যাইতেছে, আসিবার উদ্দেশ্যটা প্রকাশ করিয়া ফেলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কোনমতেই পারিয়া উঠিতেছেন না।

সাড়ে-নয়টা বাজিল, ঘড়িই সেটা সশব্দে জানাইয়া দিল। অবশেষে আমিই প্রশ্ন করিলাম, "এত রাত্তিরে স্বরূপের বাড়ি, ঠাকুরদা?"

অবিনাশ-ঠাকুরদা যেন একটা থেই পাইলেন। কয়েকবার খুব ঘন-ঘন তামাক টানিয়া বলিলেন, "আর বোলোনা সেরোর কথা ভাই, গয়নার কথা বারণ করে দিয়ে আসতে হ'ল।"

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "বারণ করে? কেন?"

"বিয়ে করবে না।"

আমি অকৃত্রিম বিস্ময়ে উঠিয়া বসিলাম, প্রশ্ন করিলাম, "করবে না বিয়ে অজয় ? কারণ ? কি বলছে সে ?"

অবিনাশি-ঠাকুরদার তামাক টানার গতি প্রায় দ্বিগুণ হইয়া গেল। তীব্র কৌতুকে আমি উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলাম। বেশ বুঝিলাম, মোক্ষম কথাটি একেবারে কণ্ঠে আসিয়া পড়িয়াছে, আর বিলম্ব নাই।

ঠাকুরদা টানের ক্ষিপ্রতার উপযোগী একটা সুদীর্ঘ সুখটান দিয়া মুখ ঘুরাইয়া হুঁকাটা রাখিতে রাখিতে বলিলেন, "কারণ আর কি ?...'করবো না, আমার ইচ্ছে' !"

এ-ভাবে ঔৎসুক্য ঠেলিয়া রাখিবার জন্ম রাগও হইতেছিল, জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবু ?"

"...উপহার চাই—পদ্য !"—বলিয়া ঠাকুরদা আরাম-কেদারায় হেলিয়া পড়িয়া উগ্র প্রত্যাশায় আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আপনা হইতেই একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়িল।

বলিলাম, "এই কথা ? তা এর জন্তে কি বিয়ে বন্ধ হবে ? আপনি স্যাকরার বাড়িতে বারণ করে দিয়ে এলেন ?"

মুখের ভাবে বুঝিলাম, ঠাকুরদার মনটাও কতকটা হাল্কা হইয়াছে।

"তা হ'লে চাকরটাকে বলো, কল্কেটা আর একবার সেজে নিয়ে আসুক।"—বলিয়া চেয়ারটা আমার দিকে একটু টানিয়া লইলেন, তাহার পর কণ্ঠস্বর একটু নামাইয়া বলিলেন, "সেই পরামর্শ করতেই তো তোমার কাছে আসা, শৈলেনভায়া ! আজ বাদে কাল বিয়ে, সব ঠিকঠাক, শেষ কালে কিনা তুচ্ছ উপহারের জন্তে সব ভেস্তে যাবে ! কিন্তু অজুকে তো জানো ? যা ধরবে একবার, ছাড়ায় কার সাধ্যি ! একবার ভাবলাম, নিজেই দিই একটা লিখে ; এক সময় অত যাত্রার পালা বেঁধে বেঁধে বিলি করেছি, আর আজ নাতি আবদার ধরেছে—আবার ভাবলাম, নাঃ, শৈলেনভায়াকেই বলি, ও আজকাল লিখছে-টিকছে শুনছি..."

বলিলাম, "ঠাকুরদা, আমাদের লেখা তেমনই ; তার ওপর পদ্যের কথা শুনলে তো গায়ে জ্বর আসে ; একবার পৌরোহিত্যি করে চেষ্টা করেছিলাম ; মাঝপথে এসে 'ধর্ম'র মিল খুঁজতে কালঘাম ছুটে যায়, তখন কপাল মুছতে গিয়ে 'ঘর্ম' কথাটা মনে পড়তে সে যাত্রা পরিত্রাণ পাই ; সেই থেকে কিন্তু নাকে-খৎ দিয়েছি, আর ও-মুখো নয়।"

ঠানদি বেচারী বঞ্চিতই হয়েছে বলতে হবে তো? আজকাল যখন এসব হয়েছে, তখন হবে তোমার একটু মেহনৎ, তা—আর তেমন অসুবিধে হয় নোলকটা-মলটা নাহয় বসিয়েই দিও। আর দেখ,—ইয়ে—আমার নামেই দেবে, বুঝলে তো?—মানে, আমি যেন পদ্যটা লিখে নাতবউকে…”

ভাবের আপন বেগেই বোধ হয় ঘোরটা কাটিয়া গেল। ঠাকুরদা যেন একটু লজ্জিতভাবে হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, “বড্ড রাত হয়ে গেল, তাই তো! আচ্ছা, উঠি তাহ'লে এখন। যেমন হয় একটা লিখে দিও, নেহাৎ খালি যাবে? তাই বলতে এসেছিলাম।”

দরজার কাছে গিয়া একটু দাঁড়াইলেন—একটু ইতস্তত: ভাব; তাহার পর ফিরিয়া আসিতে আসিতে বলিলেন, “কি দিব্যি পদ্যটি এখনই বললে শৈলেনভায়া! দাও তো একটা চিরকুটে লিখে। আর কিছু নয়, একটা ভালো জিনিস উঠলো তোমার মনে—ভুলে গেলেই তো গেল নষ্ট হয়ে, তার চেয়ে ভাবলাম লিখে রেখেই দেওয়া যাক্ না কাছে।”

কবিতাটি লিখিয়া দিলাম, আরও খানিকটা শাখাপল্লবে বিস্তারিত করিয়া; নোলক-প্রশস্তি শেষ হইলে মলেরও খানিকটা বন্দনা গাঁথিয়া দিলাম।

তাহার পরদিন সকালে প্রীতি-উপহারের জন্য কাগজ-কলম লইয়া বসিলাম।

কবি নই, তার সরস্বতীর এলাকার মধ্যে প্রীতি-উপহারের মতো অমন অপ্রীতিকর কিছু নাই। নিতান্ত যদি অজয় আর তাহার নববধূ লইয়াই হইত, তাহা হইলে বসিতাম্ না; কিন্তু ব্যাপারটা তো ঠিক তাহাই নয়। অর্ধ-শতাব্দী পূর্বেকার একটি এগারো বছরের নোলক-পরা মেয়েকে ঠাকুরদা নবযুগের নববেশে নূতন আবেষ্টনীর মধ্যে আবার নূতন করিয়া গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, যে-গৃহ বোধ হয় এবার শীঘ্রই একদিন ওপারের আহ্বানে ছাড়িয়া যাইতে হইবে। কালকের নৈশ কাব্য-অভিযানের গোড়ায় এই কথাটাই ছিল, ঠাকুরদা না-চাহিয়াও ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন।

ভাবিলাম, জীবনে অন্ততঃ একবার নাহয় কবি হওয়ার চেষ্টাই করা যাক্ না। এতেও যদি কবিতা না আসে তো আসিবে কিসে?

চতুর্থ লাইনের মিল খুঁজিতেছি, এমন সময় ভিতর-বাড়িতে হঠাৎ হাসির একটা হর্‌রা উঠিল। আরও অন্যান্য সবার সঙ্গে ঠানদিদির গলা। ঠানদিদি

চলেন ঢেউয়ের মতো, গতিতে থাকে হিল্লোল, আর উপস্থিতিতে সেই হিল্লোল উচ্ছ্বাসে ভাঙিয়া পড়ে।

ঠানদিদি যেখানে পৌঁছিবেন, সে-জায়গাটা রসে-বিদ্রূপে, পানে-গুলে-জর্দায় মুহূর্তেই জাগিয়া উঠিবে—স্থানবিচার নাই, বয়সের বিচার নাই—একষট্টি বৎসরের সুদীর্ঘ জীবনে ঠানদিদি আর সবকেই বাতিল করিয়া মাত্র একটি অবস্থাকেই বাঁধিয়া রাখিয়াছেন—তাহা রসোচ্ছল যৌবন। বুঝিলাম, নিচে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেছে। ঠানদিদি বলিতেছেন, "না, তোরা ছাড়, দিকিন একটু, যা করতে এসেছি আগে সেরে নিই সেটা...তোমার কর্তাটি কোথায় গো? তার ঘাড়ে কাব্যি চাপিয়েছে শুনলাম! সাবধানে থাকিস্ বাছা, অমন জবরদস্ত সতীন আর নেই, ভুগেছি কি না এককালে!"

গৃহিণী কিছু উত্তর দিল, কি না-দিল, বোঝা গেল না। তন্বীর কণ্ঠস্বর শুনিলাম, "দাদা ওপরে ঠানদি, চলো না।"

"তোরা বোস্ একটু, আমি ভূত ছাড়িয়ে আসি।...বউ, আমার ফী যোগাড় করে রাখ্—পান থেঁতো করে!"

মিশ্র বিদ্রূপ-কলরবের মধ্যে কে কি বলিল শুনিতে পাইলাম না—মাত্র একটা প্রবলতর হাসির উচ্ছ্বাস উঠিয়া আসিল। একটু পরেই সিঁড়িতে শুনিলাম, "নাঃ, আর পারি না বাছা! বয়েসের সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে আর ছাতের সিঁড়ি ভাঙা কুলিয়ে ওঠে না ক্ষ্যামতায়।...কোথায় গো কবি-মানুষ?"

বলিলাম, "আসুন ঠানদি, কী সৌভাগ্য!...কিন্তু ওকি অলুক্ষুণে কথা! বয়েসের সিঁড়ি ভেঙে আপনি তো নিচের দিকেই গেছেন—আপনার একষট্টিকে আমরা তো ষোল বলেই জানি ঠানদি!"

"—না ভাই, আর চলে না।"—বলিয়া ঠানদিদি একটু ক্লান্তভাবে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর টিনের ডিবা হইতে মুখে একটু গুল আলগোছে ফেলিয়া বলিলেন, "দিলে বুঝি ঘাড়ে কাব্যি চাপিয়ে গেছে কাল রাত্তিরে এসে? মুয়ে আগুন, সাতটা কাল আমার জালিয়েছে, এখন...কাল রাত্তিরে ভিজে চুপসে বাড়ি গিয়ে হাজির।...'কি গো, একি কাণ্ড!' তা বলতে কি চায়! শেষকালে অনেক কষ্টে...কি? না, 'শৈলেনকে পিতৃভক্তি-উপহারটা সেকবার মাল-মশলা দিয়ে এলাম।' কি আদাড়ে বোঁক বলো তো?—মুয়ে আগুন! 'খবরদার, আর ওমুখো হবে না। শেষকালে

শীতে-বাদলে সান্নিপাতিক ধকল’…কিন্তু ঝোঁক তো জানি, তাই ভাবলাম একবার দেখেই আসি না হয়, বলে আসি তাড়াতাড়ি যা হয় একটা ঠিক্ নিতে।…তা কিছু ফিরলে নাকি? যা হয় তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা চাই।”



‘…আপনার একষট্টিকে আমরা তো ষোল বলেই জানি ঠানদি।’

বলিলাম, “চেষ্টা তো করছি ঠানদি, কিন্তু হচ্ছে কই?—এই দেখুন না। সেই কথাই তো বলছিলাম ঠাকুরদাকে—বলি, ঠানদির আমলের আপনারা যেমন এক কথাতেই কবি হয়ে উঠতে পারতেন—এ-যুগের এদের নিয়ে কি আমরা পারি তেমন?”

ঠানদিদির মুখটা ভিতর থেকে যেন একটু দীপ্ত হইয়া উঠিল। গালের পান মুখের মধ্যে নাড়াচাড়া করিতে করিতে একটা জোরে হাসিয়া পড়িয়

বলিলেন, "মুখে আগুন! কবি না হাতী!—তবে জানিয়েছে অনেক বটে। লিখ্ছে তো লিখেই যাচ্ছে, বসে আছে তো অমন বসে বসেই আছে, আবার জুড়িয়ে যায়, পহরের পর পহর রাত কেটে যাচ্ছে, পাতা নিচ্ছি, লেখার আর বিরাম নেই—খোলক, থোপা, ছাই-ভস্ম—সে সব কি মনে আছে না? না, সে আজকের কথা?…তাই বউকে বলছিলাম, 'বলি, বউ, অমন সতীন যেন ঘরে না ঢোকে—দেখিস্!'—ঠানদিদি ঘাড়টা উল্টাইয়া হাসিয়া উঠিলেন।

বলিলাম, "আপনার নাতবউয়ের সে ভয় নেই ঠানদিদি; এ যা সতীন, এ-সতীনের টানেই আসে!"

যেন মনে হইল, ঠানদিদি মাঝে মাঝে একটু অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেছেন। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তা, এতই যদি উপহারের ঝোঁক, তো নিজেই নিকুক্ না লিখে!"—বলিয়া অনুপস্থিত ঠাকুরদার উদ্দেশ্যে নথের একটা তীব্র ঝাঁকানি দিলেন।

বলিলাম, "তা হ'লে তো খুবই ভালো হ'ত। বিশেষ করে তাঁর নিজের নামে যখন লিখতে বলেছেন; কিন্তু কাজের ভিড়ে রয়েছেন, তায় আবার অব্যেসটাও বোধ হয় ছেড়ে গেছে…"

"—পোড়া কপাল, কাজ তো ভারি! নাতির বিয়েতে রস আরও নতুন করে চাগিয়ে উঠেছে—অসৈরণ! আর ওব্যেস ছাড়বে? বলে, স্বভাব না যায় ম'লে, ইল্লৎ না যায় ধুলে,—কাল আদ্দেক রাত পর্য্যন্ত…"

ঠানদিদি হঠাৎ থামিয়া গিয়া মুখে খানিকটা গুল ফেলিয়া দিলেন। আমি কোন প্রশ্ন করিলাম না, মুখের দিকে চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ঠানদিদি, আমার চোখে চোখ পড়িতেই হঠাৎ যেন একটু বেশিরকম লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। সেটা কাটাইবার জন্যই হোক্ বা যে জন্যই হোক্, মুখের পান ফেলিবার অছিলায় জানালার কাছে উঠিয়া গেলেন, এবং পান ফেলিতে ফেলিতে বাহিরের দিকেই চাহিয়া বলিলেন, "আমি বলছিলাম কি শৈল, পারিস্ তো মাথা ঘামিয়ে নেক্, আর না-পারিস্ তো এক উপায় আছে…"

উৎসুকভাবে বলিলাম, "পারছি যে কত সে তো দেখতেই পাচ্ছেন। কোন উপায় থাকে তো বলুনই না ঠানদি, রেহাই পাই।…"

"আছে উপায়।"—বলিয়া ঠানদিদি আসিয়া আবার চেয়ারে বসিলেন। বোধ হয় যেন একটু কম্পিত হস্তেই আবার খানিকটা গুল মুখে দিলেন, তাহার পর আঁচলের একটা গেরো খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "আর সবই কোন্

চুলোয় বসে গেছে—নাতবউ এলে মুখ দেখবো কি দিয়ে, তাই বাক্স থেকে একটা গয়না বের করতে গিয়ে এই চুটো হাতে ঠেকলো। আমি কি ছাই পড়তে জানি, না ভালো লাগে! [illegible]! তা যাহোক মাথা ঘামাল না করে তুই ওই চুটো দিয়েই নিবৃত্তি-উপহার না কি—তাই দিবে দে—বুড়োর নামে বলেছে, ওর নামেই দে,—কেউতো ধরতে পারবে না; কিন্তু কাজ হয়ে গেলে ফিরিয়ে দিস্ বাপু, আমি নিজের হাতে ছিঁড়ে ফেলবো।...এই সব আদিখ্যেতা হ'ত তোমাদের ঠানদিকে উপলক্ষ করে—মুখে আগুন, মুখে আগুন!—চিরকালটা এই ভাবে জ্বালিয়েছে কম?"

ঠানদিদি আর বসিলেন না। কেমন একটা লজ্জা, গৌরব আর সেই সঙ্গে কতকটা অবহেলার ব্যর্থ প্রয়াসের সঙ্গে দুই টুকরা কাগজ আমার হাতে দিয়া উঠিয়া গেলেন।

* * *

কাগজ দুইটি খুলিলাম। একটির বয়স অর্ধশতাব্দীর কাছাকাছি হইবে। সেকালের অনুপ্রাসবহুল একটি পদ্য—ভালো পড়া যায় না। কালি প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, তাহার উপর তাম্রাভ কাগজটি ভাঁজে ভাঁজে জীর্ণ, নিচে এক টুকরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাগজ দিয়া খণ্ড অংশগুলি জোড়া, তাহাও উল্টাপাল্টা করিয়া। তবে বুঝিলাম, যাহার উদ্দেশ্যে লেখা, সে 'দ্বাদশকলা বিধু জিনি'—কিছু একটা।

অপর টুকরাটি পড়িতে কষ্ট হইল না; বিস্ময় হইল, যদিও তাহাও না-হওয়াই উচিত ছিল,—এটি কালকের আমারই লেখা নোলক-মণ্ডের স্তবগান। বুঝিলাম, ঠাকুরদাদা নিজের নামে চালাইয়া ঠানদিদিকে উপঢৌকন দিয়াছেন, ঠানদিদির নোলক-মণ্ডের যুগ স্মরণ করিয়া। ভালো, আমার কবিতা 'আজি হ'তে শতবর্ষ পরে' কোন তরুণীর হাতে না পৌছাক, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের একটি দ্বাদশীর স্মৃতিতে যে আঘাত দিয়াছে, এটাই কি কম কথা?

'কাল আদ্দেক রাত পর্যন্ত'—ঠানদিদির সেই অর্ধসমাপ্ত অনুযোগের অর্থটাও বোঝা গেল।

কিন্তু সত্যই কি অনুযোগ? বা অনুযোগটা কি সত্য? একা কি ঠাকুরদাদারই দোষ? নাতি, যাহাকে শানাইয়ের বাঁশির সঙ্গে ঘরে আনিতেছে, তাহার মধ্য দিয়া ঠানদিদিও কি পঞ্চাশ বৎসরের আগেকার পুরাণো প্রীতি, পুরাণো প্রীতি নূতন করিয়া আদায় করিয়া লইতে চাহেন না?

[অলকা, চৈত্র ১৩৪৪]

ইডেন গার্ডেন্‌স। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। এই একটু আগে মাঠে ক্যাল-কাটা গ্রাউণ্ডে একটা খেলা ভাঙিল, নিজের বিজয় এবং পরাজয়ের অনুপাতে প্রশংসা বা কটূক্তি বর্ষণ করিতে করিতে দলে দলে লোক বাগানের বিসর্পিত পথ বাহিয়া চলিয়াছে, অভিমতের সংঘর্ষে এক একটা দল আবার বেশি রকম উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে, দাঁড়াইয়া পড়িয়া নিজেদের মধ্যেই বিদ্রূপ এবং কটূক্তির আদানপ্রদান করিতেছে, দুই-একজন জামার আস্তিন পর্যন্ত গুটাইয়া তুলিতেছে, তাহার পর আবার সমস্ত দলটা গন্তব্য পথ ধরিতেছে।

গজানন জলের ধারে একটা বেঞ্চে পাশ ফিরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। এক একবার বেঞ্চের পিঠে হেলিয়া পড়িয়া নিজের ব্যাক্-ব্রাশ করা চুলের খানিকটা খামচাইয়া ধরিতেছে, এক একবার আবার আধসোজা হইয়া বসিয়া স্থিরনেত্রে সান্ধ্য আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে, মাঝে মাঝে এক একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে। পাঞ্জাবির পকেটের নিচেটা আধ হাতের উপর ছেঁড়া, ঝোলা অংশটা বাতাসে ফর ফর করিতেছে।

হীরু আসিয়া পাশে বসিল। তাহারও পাঞ্জাবি পিঠের কাছে প্রায় অর্ধেকটা ছেঁড়া, চুল উস্কখুস্ক, দৃষ্টি উদাস। খানিকক্ষণ চুপ করিয়াই রহিল, তাহার পর আস্তে আস্তে বলিল, "বাড়ি চল্, আর করবি কি?"

গজানন এলাইয়া পড়িয়াছিল, 'উফ্' করিয়া একটা মোটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সোজা হইয়া বসিল; বিপরীত দিকেই চাহিয়াছিল, ফিরিলও না, কোন উত্তরও দিল না। একটু থামিয়া হীরু আবার বলিল, "বোধ হয় বিষ্টি নামতে পারে, ভিজে যেতে হবে।"

গজানন ঘাড়টা একটু ঘুরাইয়া বলিল, "তুই এগো, আমি একটু ঘুরে আসছি। আমাদের বাড়িতে মুখটা বাড়িয়ে একবার দিদিকে বলে যাস্—শরীরটা তেমন ভালো নেই, আমার চাল যেন না নেয়।"

আবার ঘুরিয়া এলাইয়া পড়িল।

হীরু না উঠিয়া চুপ করিয়া বসিয়াই রহিল। একটু পরে সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বলিল, "না খেয়ে রাত্তির কাটাবি? সমস্ত লীগটা এখনও পড়ে রয়েছে, তারপর আই-এফ্-এ। এখেলা তো হালচালই এই।"

গজানন ঘুরিয়া বসিল, অবসাদের মধ্যেও একটু রাগিয়া সাক্ষী মাস্টার মতো করিয়া বলিল, "ঐ বিত্তিরের খেলা?—তুই-ই বল্? পারতো না ও আটকাতে বলটা? বাঁ পায়ে ভর দিয়ে একটা হাল্কা জাম্প্, তারপর একটু ভোঁয়া দিয়ে বলটা বলুডেনের মাথার ওপর দিয়ে টপকে নিয়ে একটা শট্,— না পারতিস্, সামনে উইং দাঁড়িয়ে রয়েছে, একটু ট্যাপ্ করে দিলে তার পায়ের



'…তুই-ই বল্…'

ওপর গিয়ে পড়ে। একটা শিশুকে দাবিয়ে দিলে সেও এটুকু বুঝে নিতে পারতো, আর ও কিনা…। বেশ পারলি না পারলি না; হাঁদা গজাননের মতো গোল-কীপারের নজর আটকে দাঁড়িয়ে রইলি কেন?…"

মুখ চোখ রাঙা হইয়া কপালের শিরা ফুলিয়া উঠিল।

হীরু বলিল, "তুই তো দুটো গোল দেখেই উঠে এলি, আমার যে জোগাড়! যে বলটা মারলে, মনে হয় আর ফিরে যাবে না। 'আহি মধুসূদন, আহি মধুসূদন'—ডাক ছাড়িয়ে কেঁদে দিয়েছিল। 'আজ [illegible] যদি [illegible] কেউ হ'ত তো জগে বারোখানি। বুকে শীতিমত [illegible] হয়ে গিয়েছিল, উঠেই আসছিলাম, এমন সময় দত্ত একটা [illegible] বল পেয়ে, ভেডিস আর ল্যামবার্টকে কাটিয়ে দিলে একটা গোল শোধ দিয়ে। বসে গেলাম, ভাবলাম বুঝি হাওয়াটা ফিরলো,—আর-নায়ের মহিমে আছে তো? সময় কম, আর বাকিটা যদি শোধ দিয়েও, দিতে পারে তো ...শোধ?—পাঁচ মিনিটের মধ্যে ধাঁ ধাঁ করে দুটো খেয়ে বসলো—ফোর টু ওয়ান! মনে মনে জপছি—মা, রেফারীর ঘড়ির কাঁটাটা বাড়িয়ে হুইসেলটা তাড়াতাড়ি বাজিয়ে দে একবার..."

আবার দুইজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসিয়া দুর্যোগটা লইয়া মনে মনে তোলপাড় করিতে লাগিল।

একটু পরে হীরু প্রশ্ন করিল, "তোর সত্যিই দেরী হবে?"

গজানন উত্তর করিল, "হবে একটু।"

"তাহ'লে উঠি। গিয়ে বোধ হয় দেখবো সে বুড়ো দাঁত মুখ খিঁচিয়ে টেবিল আগলে বসে আছে। বিপদ একরকম?...এমন একটা ইয়ে হয়ে গেল, এখন পড়ায় কখনও মন বসে মানুষের?"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল," সত্যিই তাহ'লে তোর দিদিকে যাবো নাকি বলে যে..."

গজানন একটু বিরক্তির সহিত বলিল, "মাথা খারাপ হয়েছে তোর?—ওরা কুঁচকি-কণ্ঠা ঠেসে গোল খাক্, তাইতেই আমার পেট ভরে যাবে।"

হীরু একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "আমিও তো সেই কথাই বলছিলাম। শুধু তো তাই নয়, চেঁচাতে চেঁচাতে এদিকে বেদম হয়ে গেছে লোকে।...কিসের এত মাথা ব্যাথা রে বাবা? তোরা খেলবি নি, গোল খেয়ে মরবি, আর আমাদের পিতৃমাতৃ দায় পড়ে গেছে যেন!

হীরু চলিয়া গেল, গজানন আবার নিজের ফুলকিটা খামচাইয়া সেইভাবে

বেঞ্চে হেলিয়া পড়িল, মনের ক্ষোভে কতকটা যেন নিজে হইতেই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "মা, কি করলি ? ফোর টু ওয়ান !"

অনেকক্ষণ নিঝুম হইয়া পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যা উৎরাইয়া অন্ধকার যখন বেশ গাঢ় হইয়া আসিল, ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কত দিনের উপবাসীর মতো শিথিলগতিতে এস্‌প্ল্যানেডের ট্রাম ডিপোর দিকে অগ্রসর হইল।

কালীঘাটে ট্রাম থেকে নামিয়া গজানন অনেকক্ষণ ফুটপাথের উপর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া যে দিকটা কালীমন্দির সেইদিকে চাহিয়া দাঁত দিয়া বুড়া আঙুলের নখটা খুঁড়িতে লাগিল। গজাননের বাড়িটা রাস্তার বাঁ দিকে—কয়েকটা গলি দিয়া বেশ খানিকটা যাইতে হয়। যতদিন ফুটবল চলে, ট্রাম থেকে নামিয়াই মন্দিরের দিকে চাহিয়া ভক্তিভরে একটি প্রণাম করে, তাহার পর ওই দিক দিয়াই ঘুরিয়া দেবী দর্শন করিয়া এবং মনোগত প্রার্থনাটুকু নিবেদন করিয়া বাড়ি চলিয়া যায়।

প্রার্থনা যেদিন যেমন প্রয়োজন—"মা, কাল দত্তর হাঁটুটা যেন একেবারে সেরে যায়, ওদিকে দু'দিন আবার রেস্ট্ পাবে, তখন যা মনে হয় করিস··· সোমবার এসে গেল মা, ওদের ল্যাংচা গাঙুলিকে একটা দিনের জন্যে বাড়ি বসিয়ে রেখো, যেমন করে তোমার খুশি, তবে মাথা ব্যাথার চেয়ে ভেদবমি হ'লেই পাকা হয়···আবার বাঁচিয়ে দেওয়া সে তো তোরই হাতে—রোজই তো দেখছি কী অসীম শক্তি তোর মা···"

কিছু ফলে, কিছু বৃথা হয়—এই করিয়া কাটিয়া যাইতেছে। আজ কিন্তু চোটটা বড় লাগিয়াছে। গাড়ি থেকে নামিয়াই মন্দির উদ্দেশ করিয়া যে নিয়মিত প্রণাম, সেটা এখনও হয় নাই। বিশ্বাসের অভাব নয়, অভিমান,—আক্রোশ বলিলেও বোধ হয় বেশি ভুল হয় না, মনের মধ্যে কেবল একটা চিন্তা উথলিয়া উঠিতেছে—ফোর টু ওয়ান !—ফোর টু ওয়ান !! উফ্ !...

শেষ পর্যন্ত বোধ হয় সোজা বাড়িই চলিয়া যাইত, কিন্তু একটা কথা হঠাৎ মনে পড়িয়া যাওয়ায় গজানন যেন অতিমাত্র চকিত হইয়া উঠিল এবং মন্দিরের পানে চাহিয়া অন্য দিনের চেয়ে ভক্তিভরে একটা প্রণাম জানাইয়া দিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল। ত্রস্ত পদক্ষেপ দেখিয়া মনে হয় যেন এতক্ষণ ধরিয়া টালমাটাল করিয়া মস্ত বড় একটা অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে।

আরতি আরম্ভ হইয়া গেছে, ভয়ানক ভিড়, গজানন গিয়া নাটমন্দিরের

একটা থাম ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। স্থির নেত্রে মন্দিরের পানে চাহিয়া আছে, দৃষ্টি ভাবাকুল—বোধ হয় একটু বাষ্পাকুলও। বড় ভুল হইয়া গেছে, ইচ্ছা করিলেই আরতির পূর্বে আসিয়া হাজির হইতে পারিত, কেন যে এমন মতি-গতি হইল—দুর্লক্ষণ। মা কি মনে করিবেন? "অথচ ভক্তি যে তোমার প্রতি এক তিলও কম নেই, সেটা তো বুঝতেই পারছো মা..."

আরতি শেষ হইলে শত শত কণ্ঠ-নিঃসৃত মা-মা শব্দে সমস্ত জায়গাটা গম গম করিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে যাহার যা প্রার্থনা—কাহারও স্বার্থ লইয়া, কাহারও নিঃস্বার্থ। গজানন অন্য দিন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া চলিয়া যায়, আজ শানে কপাল ঠেকাইয়া একটু পড়িয়া রহিল, উঠিবার সময় অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ নাকটা শানে একটু ঘষিয়া লইল, তাহার পর করজোড়ে করুণনেত্রে মূর্তির পানে চাহিয়া বলিল, "আজ যা হয়ে গেল তার আর চারা নেই মা, কাল কিন্তু মহমেডান স্পোর্টিং..."

পরদিন খেলা দেখিয়া দুইজনে ফিরিতেছে, ড্র গেছে, আজ আর ইডেন গার্ডেন্‌সে চুল খামচাইয়া পড়িয়া থাকিবার দরকার হয় নাই। খুব প্রফুল্লচিত্তে আলোচনা করিতে করিতে দুইজনে এসপ্ল্যানেডের দিকে চলিয়াছে, তাড়াতাড়ি ট্রাম ধরিয়া কালীঘাট—আজ আবার আরতিটা যেন ওরকম আধা-খেঁচড়া হইয়া না যায়; গজাননের মনে কেমন একটা খুঁৎখুঁতুনি লাগিয়া আছে—কাল আগাগোড়া উপস্থিত থাকিলে আজ দুটা পয়েন্টই হাতে আসিত,—আজ জেতা খেলা ড্র হইয়া গেল, তাও পেনাল্টি শটে।... আজকের আপশোষ এই দিক দিয়াই, তবুও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে ড্র—ওরই মধ্যে মস্ত বড় একটা সান্ত্বনা আছে, প্রায় বিজয়ীর উল্লাস।

নিজেদের মধ্যেও আলোচনা হইতেছে, আবার চলিতে চলিতে পরেদের আলোচনারও মাঝে মাঝে যোগ দিতেছে,—"মিত্তিরকে যে দোষ দিচ্ছেন, মিত্তির যে কাল দাঁড়াতে পেরেছিল এই ঢের...খুব বচন দিচ্ছ যে হে ছোকরা, মিত্তির কাল টীমটাকে একেবারে বসিয়ে দিলে, আর...থামুন না মশাই, একশ-তিন ডিগ্রী জ্বরের ওপর কুড়ি গোল দুইবেলা তুলে কোন্ মিয়া কিচ্ছ দিতে পারে একবার দেখবার সাধ আছে, সোহাৎ মিত্তির, তাই..."

অবশ্য মিথ্যা কথা, বাড়ির গায়েই বাড়ি বলিয়া মিথ্যাটাকে আরও পুষ্ট করিয়া হুন্ হুন্ করিয়া আগাইয়া যাইতেছে। আবার অন্য একদল—আজকের পেনাল্টি গোলটা লইয়া তীব্র আলোচনা হইতেছে, গজানন্দ-ঠাকুর গতিটা আবার একটু শ্লথ হইল, আজ এদের সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ আলোচনাই যেন গায়ে বিষ ছড়াইয়া দিতেছে।



নাকটা পাশে একটু ঘষিয়া লইল…

"বলছেন যে, আজ ওর অবস্থা জানেন? নেহাৎ ওই, তাই গোল আগলে দাঁড়াতে পেরেছিল…একশ-তিন ডিগ্রী জ্বর গায়ে নিয়ে…"

"একশ-তিন ডিগ্রী জ্বর!"

"কুড়ি গ্রেন্ কুইনেন ঠুসে কোন রকমে টলতে টলতে খেলেছে—নইলে ও পেনাল্টি তো ওর নস্যি মশাই…"

"সত্যি নাকি?…তাই মাঝে মাঝে ওরকম…"

"এই হীরুই তো কুইনিন এনে দিলে সেন কার্মাসি থেকে, ওর বাড়ির পাশেই বাড়ি। বল্‌না রে হীরু, কথা কইছিস না যে?"

সমস্ত রাস্তায় টীমের প্রায় পাঁচ-ছয়জনের একশ-তিন ডিগ্রী জ্বরের হিসাব দিয়া কালীঘাট ডিপোর ট্রাম হইতে নামিল। তাহার পর মন্দিরে প্রণামাদি সারিয়া দুইজনে গঙ্গার ঘাটের রাণায় গিয়া বসিল। হীরু বলিল, "আজকে যে রকম দেখালে, মা যদি একটু দয়া করেন, লীগটা মুঠোর মধ্যে; আমার তো এইরকম মনে হয়, তুই কি বলিস গজু?"

গজানন আজ এত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে যে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছে। উগ্র উদ্দীপনার চোটে খেলার মাঠে মাথার চুলগুলা বিস্রস্ত হইয়া গিয়াছিল, এখন পর্যন্ত খেয়াল করা হয় নাই; তাহারই একটা গুচ্ছ ধীরে ধীরে টানিতে টানিতে বলিল, "এখন কত যাচ্ছে? সেভেন্থ্?"

হীরু বলিল, "যাচ্ছিল সেভেন্থ্, আজ কাস্টম্‌স্‌কে টপ্‌কে আর এক প্লেস ওপরে উঠলো।"

"হুঁ…একটা পাঁঠা দেখ্ দিকিন, আগাগোড়া কালো; তোদের বাড়ির সামনেই বস্তি রয়েছে, অনেকে পোষেটোসে।"

"মানৎ করবি?"

"বিশেষ দরকার নেই, মার নিজের টীম, একটা কি যে বলে—মায়া আছেই, সেই সঙ্গে একটা গরজও; মানৎটা করে রাখলে আর একটু পাকা হয়ে থাকে। এবারে চান্স্‌টা খুব ভালো যাচ্ছে কিনা?"

"কোন্ খেলাটার জন্যে করবি মানৎ—মোহনবাগান-ইস্ট্‌বেঙ্গল, না মহমেডান স্পোর্টিং রিটার্ন্?"

"সেটা অবস্থা বুঝে দেখা যাবেখ'ন, খোঁজ নে তো আগে। সব কথা প্রকাশ করে বলতে নেই, ঠাকুরদেবতার ব্যাপার; তবে ওর আবার একটু ট্রিক্ আছে, দোব-দিচ্ছি, দোব-দিচ্ছি করে অনেকদিন টেনে নিয়ে যেতে পারা যায়। ঐ করে একই পাঁঠা খোঁটায় বেঁধে রেখে মহমেডান, ইস্ট্‌বেঙ্গল, মোহনবাগান সবগুলোকে টপাটপ টপ্‌কে ওপরে উঠে যেতে পারা যায়।"

দুইজনেই একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর হীরু বলিল, "তাতে আবার অনেক সময় উল্টো ফল হয়, মাথার মকদ্দমাটা ঐ করে গেল কিনা। জেতা মকদ্দমা; মঙ্গলবার অন্যায়ের দিন [illegible] দিয়ে [illegible] কথা, [illegible] বেরুচ্ছে। আমি মাথাকে [illegible] যাক ম্যাচটা, কি আর আটকাচ্ছে যায় এই দুটো দিনের [illegible] আমার একটু ভিত্তি-কেমন কিনা…"

গজানন বলিল, "যেমন তেমন বোঝা যায়, ঐটেকে জোড়া পাঁঠা করে দিলেই হবে। দুটোই দেখে রাখিস, তবে মনে মনে উচ্ছুগ্যু করে ফেলিস নি যেন।…চল্, ওঠ্ এবার, মন্দিরের ঘাটে বসে আর এসব কথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা ঠিক নয়।"

গলির মুখে দুইজনে ছাড়াছাড়ি হইবার পূর্বে বলিল, "আবার তরশু তো —ইস্কুল থেকে সোজা তোর ওখানে চলে যাবো, না হ'লে বড্ড দেরি হয়ে যায়।"

•

এমন প্রত্যক্ষ ফল দেখা যায় না, লীগ টেবিলে টীম এখন ছয়ের স্থান থেকে চারের স্থানে; চুণোপুঁটিদের কে পোঁছে, হোমরাচোমরা টীমগুলারও আতঙ্ক ধরিয়া গেছে। চেঁচাইতে চেঁচাইতে গজাননের গলা ভাঙিয়া গিয়াছে, এখন চুন লাগাইয়া তাহার উপর একটি মাফলার জড়াইয়া গ্যালারি থেকে খালি হাত-পা ছোঁড়ে আর কাশে, হীরুর একটা ছাতা গেছে মোহনবাগান যেদিন গোলটি খায়; ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের একদল ভক্তর সঙ্গে বাদানুবাদ করিতে গিয়া বাঁ চোখের উপর একটা কালসিটে পড়িয়াছে।

কিন্তু মনের উল্লাসে আর ওসব দিকে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই; ভক্তি করিয়া যেন আশ মিটিতেছে না। খেলা থাক্ না-থাক্, সন্ধ্যার সময় আরতিটা আগাগোড়া দেখা চাই। স্থিরনেত্রে করজোড়ে দাঁড়াইয়া সামনের খেলাটার কথা মাকে মনে করাইয়া দেওয়া আর বলা—"যদি এই রকমটাও রেখে যেতে পারো মা, তো আর আটকায় কে?…"

প্রার্থনার মধ্যে দিয়া কখন মা তাঁহার টীমের সঙ্গে এক হইয়া গেছেন।

কিন্তু মন্দিরের আরতি দেখিয়াই মন উঠিতেছে না; ইচ্ছা হইতেছে লীগটা যতদিন না শেষ হয় মায়ের চরণ দু'টি ধরিয়া পড়িয়া থাকে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া গজানন দিদিকে বলিল, "দিদি, তোর ঘরের মা-কালীর বড়

পটখানা আবার মাথার শিয়রে দিন কতক টাঙিয়ে রাখবো ? সামনে হ্যাক-ইয়াবুলি এক্জামিনটা আসছে, আর এদিকে গলা-ভাঙাটার যে কেন সারছে না বুঝতে পারছি না…"

দিদি বলিলেন, "তা যাক, রোজ রোজ দেখে [illegible] —না হয় একটা নতুন পট কিনেই আন্ না।"

"তুই অনেক দিন থেকে সিঁদুর-টিঁদুর ছোঁয়াচ্ছিস, [illegible] একটু জাগ্রত, তাই বলছিলাম।"

ভালো কথাই,—ওই বন্দোবস্তই হইল। সন্তুষ্ট হইয়াই হোক্ বা উঠিতে বসিতে নিরন্তর প্রার্থনার তাগিদে জ্বালাতন হইয়াই হোক, মা আর একটু অনুগ্রহ করিলেন,—চারের স্থান থেকে টীমটা তিনের স্থানে উঠিয়া আসিল। মাঠ থেকে ফিরিয়া গজানন কালীর পটখানা নামাইয়া একটা ছোট জলচৌকির উপর স্থাপন করিল এবং পরদিন হইতে মালা, ফুল এবং চন্দন দিয়া রীতিমত পূজা আরম্ভ করিয়া দিল,—ভাঙা গলাটা দেখাইয়া দিদিকে বলিল, "এটা যে যেতে চাচ্ছে না, তাই নাবিয়ে ফেলে এই ব্যবস্থা করলাম।"

মাঠ থেকে মোহনবাগান-কাস্টম্‌স্‌এর খেলা দেখিয়া ফিরিতে ফিরিতে হীরুকে বলিল, "পাঁঠা ছুটো ঠিক আছে রে ?"

"আছে, তবে বুড়ী তাগাদা দিচ্ছিল।"

গজানন ঠোঁটের কোণে অল্প একটু হাসিয়া আড়ে চাহিয়া বলিল, "আর কটা দিন টেনে নিয়ে চল্ না, যা বলেছিলাম মিথ্যে কি ?—দেখতেই তো পাচ্ছিস।"

তাহার পর গম্ভীরভাবেই বলিল, "তা ভিন্ন দামটা এখনও জমেনি ; আমি অসুখে পড়লেই দিদি কিছু কিছু করে মানৎ করে সিঁদুর চুপড়িতে তুলে রাখে।…কত চাইছে মাগী ? পাঁচ টাকা না ?"

"ওদিকে তাই ঠিক হয়েছিল, কাল আবার বলছে ছ' টাকা চাই,—একটার ; বলে, আমি ছ-ছটো খদ্দের ফিরিয়ে দিয়েছি, আট টাকা পর্যন্ত দিতে চাইছিল, নেহাৎ মানতের পাঁঠা বলে…"

গজানন চিন্তিতভাবে দাঁতে নখ খুঁটিতেছিল, বলিল, "কাল দেখলাম চারটে টাকা জমেছে। দমকা পেট ব্যথার নাম করে একটা দিন পড়ে থাকতে পারলে ওটা পুরো হয়ে যায়। তারপরে দিদিকে বললেই হবে, স্বপ্ন দেখলাম—মা বললেন, অত পূজো না দিয়ে একটা পাঁঠাই দিস। দিদি ভয়ে

তখনই থাকে, রাজি হয়ে যাবে। এই মতলব এঁটে রেখেছি, কিন্তু একটু বিছানা ছেড়ে তার ফুরসৎই হচ্ছে না যে…"

হীরু বলিল, "জোড়া পাঁঠার কথা বলেছিলি না?"

গজানন একটু চোখ টিপিয়া বলিল, "লীগটা তো এইতে আসুক,—এর পর আই-এফ-এ নেই?—ডবল হোক, তবে তো ডবল পাঁঠা…তুই হতভাগা পেটের কথা সব বের করিয়ে দিস বড্ড…"

নাগাড়ে জলে-ভেজা, চীৎকার, তাহার উপর মাঝে মাঝে ঘুঁষোঘুঁষি—হীরু বেচারি অসুখে পড়িয়া গেছে। বিছানায় পড়িয়া উৎসুকভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিল, গজানন্দ আসিয়া বালিশে একটা চড় মারিয়া বলিল, "টু-টু নিল্! ব্যাকেটে সেকেণ্ড! পুগে আজ একখানা খেললে বটে; ঠ্যাংটা কেটে স্পিরিটে ডুবিয়ে রাখতে ইচ্ছে করে! রানার্স-আপটা তো বাঁধা। কাল রেঞ্জার্সকে হাফ-এ ডজন দেবেই, তারপর বাকি থাকে মাত্র দুটো খেলা—ও তুই দেখে নিস, কাউকে আর দাঁড়াতে হচ্ছে না।"

হীরু বলিল, "ইস্টবেঙ্গলটা রয়েছে…"

"আমায় আর যেলা বকাস্ না হীরে, একে গলাটা কোন মতেই সারিয়ে উঠতে পারছি না।…ইস্ট্‌বেঙ্গল! ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবে! লিখে রাখ্, না মেলে তখন বলিস্। সব গোলকাণার দল, মিড্‌ফিল্ডে কেরামতি গজাও দেখাতে পারে, ড্যালহাউসির দিন কি কেলেঙ্কারিটা করলে বলুক্তো, ওকে খেলা বলে? ওরকম প্যাটার্ন্ বোনা সে তো মহাকালী পাঠশালার মেয়েরাও পারে। …আমাদের হারিয়ে লীগ নেবে! বসে বসে সাবানে হাত ধুক্ গিয়ে!"

গলা ধরিয়া খানিকটা কাশিয়া বলিল, "আর এ রবার-টায়ার গলা নিয়ে পেরে উঠি না; তুই আছিস কি রকম?"

হীরু বলিল, "আর থাকা! এমন খেলাগুলো চোখের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে।…হ্যাঁ, ঠিক কথা, আজ বুড়ী এসেছিল—বলে, পাঁঠাটার জন্যে আমায় ন'টাকা দিতে চাইছে, তোমরা যদি সাত টাকা পর্যন্ত দিতে পারো তো ধরে রাখি, নয়তো ছেড়ে দিই।"

গজানন চোখ তুলিয়া কি ভাবিল, তারপর প্রশ্ন করিল, "কি বললি?"

হীরু বলিল, "রাজি হ'তে হ'ল, মানৎ-করা ছাগল।"

গজানন বলিল, "বেশ করেছিস্; আমি একটা কথা ভাবছিলাম—যখন

পাঁচ টাকার ছাগলটা সাত টাকায় কিনে দিচ্ছি, তখন লীগের উপর তোর অসুখের ব্যাপারটাও চাপিয়ে দোবো না কেন? তাহলে তাড়াতাড়ি সেরে উঠিস্ আর কি, আমি তো এতে কোনও দোষ দেখছি না।"

অসুখের কথা, তাহার নিজের প্রাণ লইয়া ব্যাপার, তা'র সঙ্গে এরকম তঞ্চকতা, হীরুর যেন কেমন-কেমন বোধ হইল; একটু মৃদু গোছের আপত্তি জানাইল, "বেলা টানলে শেষ কালে বেন আবার না ছিঁড়ে যায়।"

গজানন বলিল, "তুই ধরতে পারছিস না, লীগ নিয়ে মানৎ করেছি, শুধু জিতলেই হবে না তো, আমাদের দু'জনের দেখাও চাই—হিসেব মতো এক পাঁঠার মধ্যে এসে যাচ্ছে না?"

* * * *

চারদিন পরের কথা। হীরু সারিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এক পাঁঠায় দুই কাজ হাঁসিল হইল না, রেঞ্জার্স কাঁকতালে একটা গোল চাপাইয়া দিয়া এগারো জনেই রক্ষণ বিভাগে থাকিয়া সময়টা কাটাইয়া দিল; গোলটা আর শোধ দেওয়া গেল না।

গজানন নিজের ঘরে চৌকির উপর পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে, হীরু তাহার পিঠের কাছে পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছে। সামনেই জলচৌকির উপর কালীর পট, অন্য দিন এই সময় সামনে কিছু টাটকা ফুল থাকে, ধুপদানি থেকে ধুঁয়ার কুণ্ডলীও আবর্তিত হইয়া ওঠে, আজ সে সব কিছু নাই।

দুজনের মধ্যে কাহারও মুখে কথা নাই, অন্যদিন হীরু মাঝে মাঝে এক আধটা সান্ত্বনা দেয়, আজ আঘাতটা এতই অপ্রত্যাশিত আর গভীর যে, তাহার মুখেও কিছু জোগাইতেছে না।...একবার এ-বুকের, একবার ও-বুকের পাঁজরা খসাইয়া এক একটি দীর্ঘশ্বাস উঠিতেছে। অনেকখানি রাত্রি হইয়া গেছে।

গজাননের বৃদ্ধা দিদি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। বার পাঁচ ফিরিয়া গেছেন, আবার আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কাতরভাবে বলিলেন, "ওরে গজু, ওঠ্ দাদা! খাবিনে, একি গেরো বল্‌দিকিন্!...রাজার রাজ্য চলে যাচ্ছে, আবার বুক বাঁধছে, আর সামান্য এক খেলা নিয়ে...অ হীরু, তুই বল্ দাদা, তোর কথাটা শোনে..."

হীরু স্থির দৃষ্টিতে কালীর পটখানার পানে চাহিয়া ছিল, করুণভাবে মুখ

ফিরাইয়া বলিল, "আজ যে আর বলবার মুখ নেই দিদি, রাজ্য গেলে রাজ্য ফিরেও আসতে পারে, কিন্তু লীগ একবার হাতছাড়া হ'লে…উফ্, রেঞ্জার্স!"

আরও ঘন্টাখানেক পরের কথা। বৃদ্ধা ক্লান্ত এবং নিরাশায় অবসন্ন হইয়া ঢাকা খাবার সামনে করিয়া একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, ঘড়ি বাজার শব্দে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন, গজাননের ঘরের দিকে বলিতে বলিতে চলিলেন, "ওরে অ গজু, ওঠ্, লক্ষ্মী আমার, দাদা আমার…এবার জিতবি, আমিই ভালো করে মার পুজো দিয়ে আসবো, বুড়ো মানুষকে আর কত…"

ঘরে কিন্তু না গজানন, না হীরু,—পট-বসানো জলচৌকিটাও শূন্য!

গজানন তখন গঙ্গার ঘাটে। হাঁটু পর্যন্ত জলে নামিয়া কালীর পট-খানার নিচের অর্ধেকটা পর্যন্ত জলে ডুবাইয়া ধরিয়াছে। মজ্জমান ছবির মুখের পানে স্থিরনেত্রে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া গভীর ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "শেষকালে মা রেঞ্জার্সের কাছে! মোহনবাগান, ইস্ট্‌বেঙ্গল, মহমেডান গেল—শেষকালে রেঞ্জার্স!…লীগ-টেবিলে তার পোজিশানটা কি একবার চোখ মেলে দেখেছিস? নিজের টীম নিয়ে কিনা রেঞ্জার্সের কাছে!…তবে আর কিসের পুজো, কিসের পাঁঠা?—কিসের গুমোর আর কিসেরই বা বেঁচে থাকা?"

পটটা মাঝ দরিয়ার দিকে ঠেলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখী হইল।

[আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫০]

আর্ট

আজ আর মনের সে সজীবতা নাই। পৃথিবীর ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ কিছুই মনে আর তেমন সাড়া জাগায় না। কেমন যেন আত্মকেন্দ্রিক হইয়া পড়িতেছি। নিজের কতকগুলি প্রয়োজন আছে; সেইগুলি সিদ্ধ হইলেই ভাবি,—যাক্, দিনটা কাটিল একরকম। আমার জীবনের বাহিরে আমারই মতো অনুভূতি লইয়া এই যে জগৎ, তাহার প্রয়োজন কতটা মিটিতেছে না-মিটিতেছে তাহাতে আর আমার যায় আসে না। ভালোই আছি এক দিক দিয়া—তবে মাঝে মাঝে এক একবার কেমন একটা ভয় হয়,—একি আমার আত্মার মহৎ মৃত্যু?…গীতার কথা ভুলিবার দরকার নাই,—জানি,

আত্মা মরে না। কিন্তু আমি গীতা-কল্পিত মৃত্যুর কথা বলিতেছিলা। আমি অনুভব করিতেছি আমার চারিদিকে একটা অদৃশ্য দেয়াল উঠিতেছে; আমি আছি," কিন্তু শুধু থাকাই কি বাঁচিয়া থাকা? আমার অনুভূতিতে যদি জগৎ না বাঁচে, তাহার সুখ-দুঃখের ঢেউ যদি আমার মনে দোলা না দেয়, তো সেটা কি বাঁচা? আমি অনুভব করিতেছি, এত সুন্দর-অসুন্দরে এত বিচিত্র এই জগৎ-সংসারের স্পন্দন আমার চারিদিকের সেই অদৃশ্য দেয়ালে লাগিয়া নিস্পন্দ হইয়া যাইতেছে।...এখন তবুও অনুভব করি, দুদিন পরে এ অনুভূতিটুকুও থাকিবে না। দেয়াল হইয়া উঠিবে আরও উর্ধ্ব, আরও ঘাতসহ, আমি হইয়া পড়িব আরও বিচ্ছিন্ন। হয়তো নিজেকে-ঘেরা সেই আরও নিশ্চিন্ত জীবনে থাকিব ভালোই। কিন্তু মরিব।

কি কারণ এর?—ক্রমবর্ধমান বয়স? অনেক দেখা, অনেক করার ফল? বুড়ো চাকরটা মাঝে মাঝে বলে, "অনেক দেখলাম বাবু, অনেক করলাম, মনে এখন ঘাটা পড়ে গেছে।"

যেটাকে দেয়াল বলিয়া মনে করিতেছি, সেটা কি মনের চারিদিকে এই ঘাটা? কেন হয় এমনটি?

কেন জানি না, আজ অলস সন্ধ্যায় বসিয়া বসিয়া বহু পূর্বের একটা দিনের কথা মনে পড়িয়া যাইতেছে—যখন ঠিক এমনটি ছিলাম না। সেদিনের কথা মনে করিয়া আজকের এই-আমাকে কি ক্ষমা করিতে পারিব আমি? আপনারাও বিচার করিয়া দেখুন না।

নূতন চাকরি লইয়া বিদেশে আসিয়াছি। আমার চরিত্রে একটা খুব বাহুল্যের দিক ছিল,—মহাজনদের জীবনী পড়ার একটা অত্যধিক শৌখ। যতই পড়িতাম, মনে হইত জীবনটাকে যথেষ্ট বড় করিয়া তুলিতে পারিতেছি না, ততই অশান্তি লাগিয়া থাকিত, ততই পড়িতাম। এই করিয়া দিন কাটিত।

সেদিন কাহার জীবনী পড়িতেছিলাম ঠিক মনে পড়িতেছে না, তবে পড়িতেছিলাম। বহুদিন পূর্বের কথা হইলেও চিত্রটি আমার চোখের সামনে এখনও স্পষ্ট। সকালবেলা, বোধ হয় রবিবার বা অন্য কোন ছুটির দিন—মন যে চিত্তাটিকে অবলম্বন করে—সেটিকে ধরিয়া থাকিতে বেশ একটি নিশ্চিন্ত অবসর পায়। বর্ষাকাল, বৃষ্টি হইতেছিল, সবেমাত্র একটু ধরিয়াছে,

আকাশে এবং পৃথিবীতে একটি করুণ তৃপ্ত ভাব। একখানি ডেক-চেয়ারে ঠেস দিয়া বারান্দার কাঠের থামে পা দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছি। বুকের উপর একখানি ভাঁজ করা বই, এক জায়গায় আমার দক্ষিণ হস্তের চারিটি আঙুল প্রবেশ করানো। মহাপুরুষের জীবনী,—কী একটা সকরুণ মহত্ত্বের কথা পড়িয়াছি, সেই দিনটির সঙ্গে সুরে সুরে মিলিয়া গিয়াছে—মনটাকে উদাস করিয়া দিয়াছে, দেখিতেছি, মহাকাশের আত্মদান,—নীরব সমারোহে নিজেকে বিলাইয়া দেওয়া।

আমার বারান্দার নিচেই গলি, বর্ষায় জনবিরল। একটি শীর্ণ গোছের মানুষ তালি-দেওয়া একটা ছাতা মাথায় দিয়া আমার সামনে দিয়া চলিয়া গেল, একটু গিয়া দাঁড়াইল, মাথা নিচু করিয়া কি যেন একটু চিন্তা করিল, তাহার পর একবার আমার দিকে চাহিয়া লইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া বারান্দার ধারটিতে দাঁড়াইল।

সত্য কথা বলিতে কি মনটা যদিও খুব করুণ সুরে বাঁধা ছিল, তথাপি বেশ সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। ঐটুকুই মনে আছে, কেন যে পারিলাম না এখন স্পষ্ট মনে নাই। একটা কথা বোধ হয় সত্য—মন যখন খুব বড় একটা চিন্তা লইয়া থাকে, তখন চিন্তা লইয়া থাকিতেই ভালোবাসে, বড় কাজ আসিয়া পড়িলে তাহার ব্যাঘাত হয়। মনে হইল লোকটা কিছু চায়। দানের যোগ্যই মনের অবস্থা ছিল, কিন্তু দানের পাত্রকে একেবারে এত হাতের কাছে পাইয়া বেশ প্রীত হইলাম না। যে উদার চিন্তা আকাশ ব্যাপিয়া ডানা মেলিয়া ছিল, সেটা যেন একটা গণ্ডির মধ্যে আসিয়া আটকাইয়া গেল। তাহা ভিন্ন আর একটা কথা ছিল,—লোকটার চেহারার মধ্যে একটা রুক্ষতা ছিল যাহা অন্ততঃ প্রথম দর্শনেই বেশ একটি করুণার ভাব জাগায় না। করুণা একটা রস, তাহার প্রকাশ আর্টের মধ্য দিয়া, সুতরাং একথা স্বীকার করিতেই হইবে নিছক দারিদ্র্যই করুণা উদ্রেক করিতে পারে না, তাহার মধ্যে আর্টের কিছু থাকা চাই। লোকটার মধ্যে তাহা কিছু ছিল না; তাহার রুক্ষাভ কোটরগত চক্ষে, অবিন্যস্ত কেশে এবং সন্ত্রস্ত গতিবিধির মধ্যে একটা লক্ষ্মীছাড়া ভাব ছিল নিশ্চয়, কিন্তু সে আতুর ভাবটি যেন ছিল না, যা সমবেদনাকে আহ্বান করে। বোধ হয় সবই আমার ঐ মনের ভুল—, চিন্তার ব্যাঘাতজনিত বিরক্তিই বোধ হয় আসল কারণ; কিন্তু মোট কথা আমি প্রীত হইলাম না।

আকাশের পানে চাহিয়া থাকায় বাধা পাইয়া বইটা খুলিলাম, পড়ার জন্য নয়, বিরক্তিটা প্রকাশ করিবার একটা উপায় হিসাবে। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসে ফিরিয়া দেখিতে হইল। লোকটা মুখের দিকেই চাহিয়াছিল, শ্রান্ত এবং কতকটা লজ্জিত কণ্ঠে বলিল, "না বাবু, উঠি, আপনাকে বিরক্ত করলাম।"

সঙ্গে সঙ্গে আরও যেন কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "ইচ্ছে করেই কি করি বাবু? ...আচ্ছা যাই, কিছু মনে করবেন না।"

বৃষ্টিটা গুঁড়ি গুঁড়ি আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল, সে উঠিতেই হঠাৎ বেশ জোরে নামিল। তাহা সত্ত্বেও নামিয়া যাইতেছে দেখিয়া বলিতে হইল, "একটু বসে যাও না হয়।"

সিঁড়িতে এক পা নামাইয়া দিয়া লোকটা ঘুরিয়া একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "আমার আবার বৃষ্টি বাবু! একটা মানুষ বাড়িতে সসেমিরে হয়ে পড়ে রয়েছে, মাথার ওপর চালে খড় নেই, একটু আগুন করবে তার উপায় নেই, পেটে অন্নের কথা ছেড়েই দিলাম..."

হঠাৎ রক্তাভ চক্ষু দুইটি দুই বিন্দু জলে ঝাপসা হইয়া উঠিল, লোকটা যেন কথাটা ঘুরাইয়া লইবার জন্যই প্রশ্ন করিল, "ঐ সামনের বাড়িতে কাঁরা এসেছেন বাবু?"

আমার অন্তর যে আর্টকে খুঁজিতেছিল, ওর আশাহত দৃষ্টিতে ফিরিয়া দাঁড়াইবার ভঙ্গিতে, হঠাৎ উদ্গত চোখের জলে, সবার উপর ওর কথা ঘুরাইয়া লইবার কুণ্ঠিত প্রয়াসে কি সেই আর্টের সন্ধান পাইল? বলিতে পারি না, তবে আমার মনটা যেন মোচড় দিয়া উঠিল, বলিলাম, "উঠে এসো, ব্যাপারটা কি?"

লোকটা উঠিয়া আসিয়া আবার পূর্ববৎ দূরত্ব রক্ষা করিয়া বারান্দার ধারটিতে বসিতে যাইতেছিল, বলিলাম, "ভেতর দিকে এসে বোসো, বৃষ্টির ছাট আসবে।"

নত কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে লোকটা সরিয়া আসিয়া দেয়াল ঘেঁসিয়া বসিল, বলিল, "ব্যাপার এক কথায় বলবার নয়, বলে আপনার মন খারাপ করতেও চাই না বাবু। এক সময় ভালো দিন দেখেছি, আজ ঘরে সন্তান আসছে, প্রথম সন্তান, হাত পাততে বেরিয়েছি। যদি খালি হাতে ফিরতে হয় তাকে তো হারাবোই, তার মাকেও বোধ হয় ধরে রাখতে পারবো না। আমার মা এই শত্রুতাটুকু করে গেছেন বাবু..."

বৃষ্টি আরও জোর হইয়াছে। অনুভব করিতেছি, কারুণ্যের রসে মনটি দ্রবীভূত হইয়া আসিতেছে। কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিলাম, "কি রকম? মায়ে কি শত্রুতা করলে?"

"করলে বই কি। সন্তান হয় নি, হয় নি; কি ক্ষতি হচ্ছিল?—তীর্থ করিয়ে, কত হাঙ্গাম করে, সাধু-সন্ন্যাসীকে দিয়ে কত মন্ত্রতন্ত্র করিয়ে—কত খরচপত্র করে তার মনস্কামনা পূর্ণ হ'তে চললো—এখন কোথায় সে? এসে দেখুক, বংশের দুলালের জন্যে দুর্যোগ মাথায় করে..."

ছেঁড়া কামিজের নিচেটা ধরিয়া চক্ষে দিল। বলিলাম, "থাক,—কষ্ট হয়, তুলে কাজ নেই সে সব কথা। সংসারের নিয়মই এই, একদিনের যা সাধ, অন্যদিনে তা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।...বাড়িতে তোমার আছেন কে?"

"কষ্টের কথা কাউকে বলি না বাবু, শোনবার লোক পৃথিবীতে খুব কম, বোঝবার লোক আরও কম। 'আহা' বলে, তাও ঠাট্টা করে, লজ্জাই সার হয় বাবু। আজ ঠিক পাঁচ মাস থেকে আমার এই রকম দশা। মা সহ্য করতে পারলেন না, ঠিক যে সুখের জীবন ছিল তাঁর এমন নয়, তবে এতটা সহ্য করা কয়া অভ্যেস ছিল না। আজ ঠিক তিন মাস হ'ল তাঁকে হারিয়েছি...ভাবলাম—থাক, দুঃখের সংসার যত হালকা হয় ততই ভালো, যে যায় সেই বাঁচে। সামান্য একটা রুজি ছিল, এক জায়গায় খাতা লিখে দশটা টাকা আসছিল, দুটো পেট কোন রকমে চলে যাচ্ছিল, মাস দুয়েক হ'ল সেটি গেছে। শাশুড়ী কাশীতে ছিল, তার ওপর টান পড়লো; দ'য়ের টান বাবু, যে যেখানে আছে সবাইকে টেনে ডোবাবে কিনা। মেয়ের ঐ অবস্থা, শাশুড়ী থাকতে পারলে না। এসে ফল এই হ'ল যে, হাতে বুড়ো বয়সের সম্বল যে ক'টি টাকা ছিল সব শেষ হ'ল। আজ চার দিন থেকে..."

স্বর রুদ্ধ হইয়া আসায় থামিয়া গেল।

বৃষ্টি আরও জোরে নামিল।

কতকটা যেন শঙ্কিত দৃষ্টিতে মেঘের পানে চাহিয়া লোকটি বলিল, "আর কী বর্ষাই পড়েছে বাবু এই চার দিন থেকে! আজ দু'দিন হ'ল শাশুড়ীর হাতের শেষ টাকা দুটি ডাক্তারের পকেটে গেল। আমি বারণ করেছিলাম, বললাম—'ছেড়ে দাও, যার যাবার সে যাক্ এই দুঃখের সংসার থেকে।' কিন্তু মায়ের প্রাণ তো? শেষ দু'টি টাকা বের করে দিলে। ডাক্তারকে ডেকে

হ'ল একবার কাকুতি-মিনতি করে বলি—বললে বোধ হয় নিতো না ভিজিটটা, অন্ততঃ আদ্ধেকটা বোধ হয় রেয়ারেৎ করতো—কিন্তু অবস্থা দেখে যার নিজের দয়া হ'ল না, তাকে প্রাণ ধরে বলতে পারলাম না, কেমন জিভে বেধে গেল বাবু। ফল এই হ'ল, ডাক্তার দেখানো হ'ল, কিন্তু তার ওষুধ আর কেনবার উপায় রইল না।...হাসি পায় না বাবু?

"কিন্তু যার কপালে দুঃখ ভোগ আছে তাকে আটকায় কে বাবু? ওষুধ না খেয়েও তো মরণ-যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে আছে এখনও। কিন্তু বাঁচবে না; আমায় এই পথে বের করবার জন্তে যতটুকু বেঁচে থাকা ওদের। ওষুধ দরকার, খোরাক দরকার, একটু শুকনো জায়গা দরকার, সব চেয়ে আগে পশুতির ঘরে একটু আগুন দরকার। শেষ পয়সাটি পর্যন্ত খুইয়ে বুড়ী পাগলের মতো হয়ে গেছে বাবু, গিয়ে দেখবো বোধ হয় সব শেষ···"

যেন অসহ্য যন্ত্রণায় নিজের মাথার রুক্ষ কেশের খানিকটা খামচাইয়া ধরিয়া নতদৃষ্টি হইয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল। আমার মনটা বেদনায় টনটন করিয়া উঠিল। বুঝিলাম এত কথা বলাইয়া লোকটার প্রতি অবিচার করিয়াছি, তাহার দুঃখের স্মৃতি মথিত করিয়া তুলিয়াছি মাত্র। যা দিবার ক্ষমতা সেটুকু দিয়া বিদায় করিয়া দেওয়াই উচিত ছিল আমার। যাহাকে মধ্যবিত্ত বলি তাহার সবচেয়ে নিম্ন যে স্তর, মনে হইল লোকটি সেই স্তরের। নিম্নশ্রেণীর হীন দারিদ্র্যের সঙ্গে মধ্যবিত্তের সম্ভ্রমজ্ঞান মিশিয়া একটা অত্যন্ত করুণ দৃশ্যের সৃষ্টি করে। পায়ে জুতা দিতে, গায়ে জামা পরিতে হয়, কিন্তু সেগুলা নগ্নতাকে যতটা ঢাকে সেলাইয়ে, তালিতে সেটাকে তার চেয়ে ঢের বেশি বীভৎস করিয়া ফেলে। এদের ভদ্র অন্নব্যঞ্জনের আলোচনা করিয়া অনাহারের লজ্জাকে চাপা দিতে হয়। মান রক্ষার জন্য ঋণে-ভিক্ষার প্রতি-নিয়তই মানকে জলাঞ্জলি দিতে হয়। সমস্ত মনটি থাকে পৃথিবীর উপর বিরূপ হইয়া, অথচ হাসির অভিনয়ে সে অসামাজিক বিরূপ ভাবকে গোপন করিতে হয়।...এখানে অভুক্ত সন্তান কাঁদিলে মায়েরা সম্পন্ন গৃহস্থের কথা ধার করিয়া বলে—আবদার ধরিয়াছে। জানে আবদারটা হয় শখের জিনিসের জন্ত, তবু ঐ বলিয়া মান বাঁচায়, বরং যাতে প্রতিবেশীর কানে ওঠে কথাটা সেই উদ্দেশ্যে একটু জোরেই বলে।

একটা নির্দোষ প্রবঞ্চনার বর্ম সৃষ্টি করিয়া এরা কোন রকমে বাঁচিয়া থাকে, অন্ততঃ তাবে বাঁচিয়া আছি। সেও একটা প্রবঞ্চনা,—আত্ম-প্রবঞ্চনা, কেন না

উগ্র মূর্তি আমি জন্মে দেখি নাই। আমি একটা কুশল প্রশ্ন মুখে করিয়া নামিতেছিলাম, সব ভুলিয়া অতি বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম।

মূর্তি ঊর্ধ্বাংশটা দোলাইয়া প্রশ্ন করিল, "আপনি বাড়ির কর্তা?"

কেমন একটা অহেতুক ভয়ে বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। কর্তামিটা অন্য



'পাড়ার সবাই অদ্ভুত ভদ্রলোকেরা!...'

কাহারও ঘাড়ে চাপাইতাম, কিন্তু বাড়িতে আমি একলা। একটু স্খলিত কণ্ঠে বলিলাম, "হ্যাঁ।"

আবার শরীরের ঊর্ধ্বাংশটা দোলার সঙ্গে একটা টানা শব্দ হইল, "হুঁ..."

মিনিটখানেক পরস্পরের মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। তাহার পরেই বোমা ফাটিল!—

"কর্তা!—ভদ্রলোক! টাকার গরমাই হয়েছে! টাকার গরমাই হয়েছে

তো নিজেরা উচ্ছন্ন যাক্‌ না—হাজারটা রাস্তা তো খোলা রয়েছে, পরের বাড়ির লোকদের ডেকে, উব্‌গার করে নেশায় টাকা জুগিয়ে যমের বাড়ি পাঠাবে কেন? আজ পাঁচটা দিন যে-মানুষ বাড়ির চৌকাঠ মাড়ায় নি, অ-স্থানে কু-স্থানে ঘুরে নেশা-ভাং করে বেড়িয়েছে—ভদ্দলোক কোথায় তাকে একটু ভালো সলা দেবে, না ট্যাকা দিয়ে আরও আস্কারা দেওয়া! একটা নয়, দুটো নয়—একেবারে দশ-দশটা ট্যাকা!—খস্‌ করে বেরিয়ে গেল ভদ্দলোকের প্যাকেট থেকে!—কী খাজাখাঁ নবাব রে!"

প্রথমটা একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছিলাম—এমন স্ত্রীলোক দেখি নাই, এমন কণ্ঠও শুনি নাই, এমন ভাবারও কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। বাড়ির সামনে এ একটা বিসদৃশ দৃশ্য, নিজেকে খুব সংযত করিয়া লইয়া বলিলাম, "বাছা, একটু ঠাণ্ডা হও, তোমার জামাই আমায় বললে, বাড়িতে তার স্ত্রীর প্রসব হবে, হাতে একটি পয়সা নেই…"

আগুনে যেন ঘৃতাহুতি পড়িল। টপ করিয়া ঘুরিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া সমস্ত পাড়াটা সাক্ষী রাখার ভঙ্গিতে হাত তুলিয়া সে যে চীৎকার আরম্ভ করিল, এখন পর্যন্ত আমার কানে খন্‌ খন্‌ করিয়া বাজিতেছে:—

"পাড়ার সবাই শুনুক ভদ্দরলোকেরা!—আমার পুরুষকে আমার জামাই বলে গালমন্দ কচ্ছে, ট্যাকা দেখিয়ে তাকে উচ্ছন্ন দিচ্ছে, আবার বলে মাথা ঠাণ্ডা করো…ভদ্দরলোক!—ও, দেখেছি কি এখন মাথা গরমের—আমি স্ত্রী-হত্যে, আপ্ত-হত্যে হবো।…আমার ট্যাকা কে খায় তার ঠিক নেই—সে হারামজাদা মিন্‌সেকে সায়েস্তা করে আনি, আর পাড়ায় ভদ্দরলোকেরা বাদ সাধে…আমি খুন হবো, আপ্ত-হত্যে হবো! হাতে হাতকড়ি পড়াবো এমন সব ভদ্দরলোকদের, তবে আমার নাম রাধী গয়লানী!"

শেষের কথাগুলা বহুদূর থেকে শুনি, তাহার পর একটা গলির বাঁক ঘুরিয়া একটা অস্পষ্ট শব্দ ভিন্ন কিছু শুনিতে পাই নাই। ওর পিছনে ফিরিবার সুযোগে, চাকরকে বাড়ির চার্জে রাখিয়া আমি নিঃসাড়ে খিড়কি দিয়া বাহির হইয়া আসি।

ভাবিতেছি—মনের চারিদিকে যে দেয়াল উঠিতেছে, রাধী গয়লানীই কি তাহার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল? না, তাহার সেই আর্টিষ্ট 'পুরুষ'? না, উভয়েই?

[সংহতি, আশ্বিন ১৩৩৩]

সম্পদের বিপদ

বিকাশ ত্রস্তভাবে বাড়িতে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল. "কাকা কোথায় গেল গা? বড্ড দরকার, এদিকে আর একটুও সময় নেই, অথচ···"

পশ্চিমের ঘর হইতে সাড়া আসিল. "কেনরে বিকু? আমরা এই দাদার ঘরে।"

বিকাশ অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "তোমরা আমায় বলছ বটে যেতে, কিন্তু···"

কথাটা শেষ করিতে পারিল না, কারণ সে ঘরে প্রবেশ করিতেই বাবা হঠাৎ মুখ ঘুরাইয়া কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া রহিলেন, বাবার বন্ধু লোকনাথ বাবু অত্যন্ত বেশিরকম মাথা গুঁজিয়া মাদুরটার উপর আঙুল দিয়া একটা '৪' অঙ্ক করিতে লাগিলেন, এবং কাকা তীক্ষ্ণ মনোযোগের সহিত সেই আঙুল চালানো লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

ডান হাতের আঙুলে হঠাৎ গরম লাগায় বিকাশ কারণটা বুঝিল, স্ফূর্তির চোটে অন্যমনস্ক হইয়া হাতে সিগারেটশুদ্ধই চলিয়া আসিয়াছে।

একটু পরে কাকা মাথা না-তুলিয়াই বলিলেন, "হুঁ, কি বলছিলি বল?"

সে তাহার পূর্বেই স্যাণ্ডেল জোড়া থেকে পা গলাইয়া [illegible] নিঃশব্দে সরিয়া পড়িয়াছে।

ছোকরা কাল শ্বশুরবাড়ি যাইবে। আজ সকাল থেকে ক্রমাগত এইভাবে কল্পিত-বাস্তব নানা প্রয়োজনে চরকিঘোরা ঘুরিতেছে, আর পদে পদেই মারাত্মক রকম ভুল করিয়া বসিতেছে। নূতন সম্পদ,—মাথা ঠিক রাখা দায় হইয়া পড়িয়াছে।

মা রান্নাঘরের দাওয়ায় কুটনা কুটিতেছিলেন। বিকাশ নিকটে গিয়া মুখটা করুণ গোছের করিয়া বলিল, "তোমরা জিদ করছ বটে আমায় যাবার জন্যে, কিন্তু···"

শৈল তরকারি-কোটায় শিক্ষানবিশি করিতেছিল, আড়চোখে চাহিয়া লইয়া বলিল, "কিন্তু, আমার পায়ে জুতো নেই।"

বিকাশ চটিয়া উঠিয়া বলিল, "দেখছ মা, চুপ করুক তোমার মেয়ে বলছি, নইলে..."

শৈল বাটিটা ঠেলিয়া একটু পিছনে সরিয়া বলিল, "নইলে জুতো পেটা করবো ওকে।"



'তোমরা আমার বলছ বটে মেয়ে...'

মা ধমক দিয়া বলিলেন, "থাম্ শৈলী, বড় ভাই হয় না?"—পুত্রের পানে চাহিয়া বলিলেন, "জিদ্ করে কি অন্যায়টা হয়েছে?—জোড়ের পর বাসুনি, তাদের একবার দেখতে সাধ হয় না?"

"সাধ হয়ে মাথা কিনেছে; আর একটি দিন মোটে সময়, অথচ...বাঃ, সাতপুরুষে কেউ যেন জামাই না হয় বাবা! সাহেবদের দেশ..."

মা মুখ তুলিয়া রাগিয়া বলিলেন, "কেন, ওদের শ্বশুর-জামাই হয় না ?"

জননীর দিকে বক্র দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বিকাশ কহিল, "শৈলী, তোমার মুখটেপা হাসি আমার সহি হয় না, হাসবি তো স্পষ্ট করে হেসে দেখ্—কি মজাটা করি।...শ্বশুর-জামাই হয়, কিন্তু...ফের শৈলী।...আমি কিন্তু মা, বাবার সো মাঝাতায় আমলের শাল গায়ে দিয়ে যেতে পারবো না,—তা বলে দিচ্ছি।"

মা আবার প্রশ্ন করিলেন, "কেন শুনি ?"

শৈল উঠিয়া আরও দূরে সরিয়া বলিল, "সায়েব জামাইরা গায়ে দেয় না।"

বিকাশ একটা পাতাহীন দীর্ঘ লাউডাঁটা তুলিয়া লইয়া সুবিধা খুঁজিতে লাগিল। মাকে বলিল, "হ্যাঁ, কোথায় একটু হাত-পা ছড়িয়ে ব'সবো, না ক্রমাগত কাঁধে পিঠে জড়িয়ে—জড়িয়ে—জড়িয়ে..."

শৈল দূর হইতে সন্দিগ্ধভাবে লাউডাঁটাটা লক্ষ্য করিতেছিল। বিকাশ বলিল, "আচ্ছা মা, কিছু বলবো না,—যদি ও ঘর থেকে আমার স্যাণ্ডেল-জোড়াটা আস্তে আস্তে এনে দিস্।...কি ভুলটাই যে করে বসেছিলাম, মা... দেখ, ভুলের কথায় মনে পড়ে গেল,—ভাগ্যিস্!"

ব্যস্তভাবে উঠিতে উঠিতে বলিল, "ছোট আবার ভেনোর দোকানে; এই এক্ষুণি সেখান থেকে এলাম! কাল যদি গাড়ি ধরতে পারি তো কি বলেছি; —ঠিক শেষ সময়টিতে মনে পড়বে কি একটা ভুলে বসে আছি; অথচ কেউ যে একটা কথা মনে করিয়ে দিয়ে উপকার করবে..."

মা চারিদিকে খুঁজিতে খুঁজিতে বলিলেন, "ডাঁটাটা কোথায় ফেলে গেলি ?"

উঠানের মাঝখান থেকে বিকাশ বিরক্ত ভাবে বলিল "হ্যাঁ, খুব পেছনে ডাকো এর ওপর; ডাঁটা আমি কাঁচা চিবিয়ে খেয়েছি..."

মা ঘুরিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অবাক কাণ্ড করলি, ডাঁটা যে তোর গলায় জড়ানো! ঐরকম ভাবে সদর রাস্তা বেয়ে দোকানে যাবি ?... দেখতো!"

বোধহয় ফুরসতের অভাবেই অপ্রতিভ না হইয়া কাঁধ থেকে ডাঁটাটা নামাইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল, "শাল-জড়ানোর কথা বলতে গিয়ে ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল। বাবার শালটা তুলে রেখো, মা; এই থাকেই এরকম ভুল হচ্ছে, নিয়ে গেলে কী যে কাণ্ড হবে!—ওর আঁচলার চওড়া কালো লতায়-পাতায় আবার মাথা গুলিয়ে যায়, আবার না দেখেও থাকা যায় না,—কি গোলমেলে কাণ্ডকারখানা বলো দিকিব্!—একটা পাতা

এদিক দিয়ে বেরিয়ে অত্ত একটা পাতার মতো কিসের সঙ্গে জড়িয়ে···
তার ওপর একটা ফুল এসে পড়েছে—মাঝখান দিয়ে একটা চওড়া লতা···
ফুলটা না গোলাপ, না পদ্ম, না ঘেঁটু—যত মনে করি ভাববো না, ততই যেন
সবগুলো মাথায় কিলবিল করতে থাকে।···ভুলে যেয়ো না, আবার হাঁসিয়া-
ওলা শালে কাজ নেই।"

ঘুরিয়া একরকম ছুটিয়াই আবার থমকিয়া দাঁড়াইল; কপালে তর্জনী চাপিয়া বলিল, "দেখ, বললাম কিনা?—কি যে ভুলে গেছলাম দিলে ভুলিয়ে!"

"তেনোর দোকানে তো যাচ্ছিলি।"

"সে কে না জানে, কিন্তু···"

শৈল নিজে আসিল না,—বাপ-খুড়াদের কথায় ফোড়ন দিতেছে। ছোট ভাইয়ের হাতে চটিজোড়াটা পাঠাইয়া দিয়াছে। সে আসিয়া দাদার দিকে জুতা দুইটা উঁচা করিয়া দাঁড়াইল। বিকাশ অন্যমনস্কভাবে সে দু'টা বাঁ হাতে লইয়া কতকটা স্বগতভাবে বলিয়া উঠিল, "হয়েছে!···ক্লিপ—সেফ্‌টিপিন্—সেফ্‌টিপিন্—তরল আলতা—স্নো—আর কি লিখেছিল?..."

শৈল আসিয়া উপস্থিত হইল, আব্দারের সুর করিয়া বলিল, "কার এলো, দাদা? আমার জন্যেও একটা এনো না..."

তাহার কথায় বিকাশের হুঁস হইল—মার সামনেই বউয়ের পাঠানো ফর্দটা আওড়াইয়া যাইতেছে। চাহিয়া দেখিল মা মিটিমিটি হাসিতেছেন, পুত্রের অবস্থা দেখিয়া মুখ উঠাইতে পারিতেছেন না।

বিকাশ একরকম ছুটিয়াই পলাইতেছিল; মা না ডাকিয়া পারিলেন না, "ওরে, জুতোজোড়াটা পায়ে দিয়ে নে; কি হ'ল ছেলের গো?···"

বিকাশ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া আগাইয়া আসিল। একজনের উপর ঝাল ঝাড়িতে পারিয়া যেন বর্তাইয়া গেল; বলিল, "শৈলী, গেছিস্ তো ভুলে? না, গিলে ফেলেছিস?—দাদার স্যাণ্ডেল বড় মিষ্টি কিনা..."

শৈল দূরেই ছিল, বলিল, "তাই যত্ন করে পকেটে পুরে রেখেছ।"

বিকাশ পকেটের দিকে লক্ষ্য করিয়া অপ্রতিভ বিস্ময়ের সহিত বলিল, "কখন এলো!"

কিন্তু অনুসন্ধানের জন্য অপেক্ষা করিবার তাহার আর অবসর নাই। পকেট হইতে জুতাজোড়াটা ভুঁয়ে ফেলিয়া আঙুলের ডগায় টানিতে টানিতে দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

খাইতে বসিয়া ক্রমাগতই আহার-বিভ্রাট ঘটিতেছে। মা প্রশ্ন করিলেন, "হ্যারে, শ্বশুরকে চিঠি দিয়েছিস্ তো?—ক'দিন থেকে তোর যা হয়েছে…"

শৈল বলিল, "কাকা দিয়েছেন কাল; ওর জরগাতেই আছে কিনা সব!"

বিকাশ হঠাৎ হাত দুইটা গুটাইয়া সিধা হইয়া বসিল; চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া বলিল, "সর্বনাশ!"

মা কিংচিৎমাত্রও বিস্মিত না হইয়া বলিলেন, "কি হ'ল?"

"শ্বশুরের কথায় মনে পড়ে গেল,—সায়েবকে এখনও দরখাস্ত পাঠানো হয় নি। জীবন নন্দীও সাড়ে দশটার গাড়িতে চলে গেল।—ঠিক চাকরিটি যাবে। দেখি; যদি ডাকটা ধরতে পারি…"

মার দিব্যি দেওয়া সত্ত্বেও উঠিয়া পড়িয়া আঁচাইতে আঁচাইতে শৈলকে বলিল, "যা তো, লক্ষ্মী দিদি আমার, সাধন ডাক্তারের কাছ থেকে সার্টিফিকেটটা নিয়ে আয় তো—পরশুই বলে এসেছি, অথচ যে নিয়ে আসবো একবার গিয়ে,…মা, এমন কথা শোনে শৈলরাণী…"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন,"আবার ডাক্তারের সার্টিফিকেট কেন?"

"হ্যাঁ, সোজা কথায় ছুটি দেবে কিনা?—সাধনকে বললাম, লিখে দেবে—বাস্ থেকে পড়ে গিয়ে পা'টা সাংঘাতিক রকম মুচ্‌কে গিয়েছে…"

মা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "দেখ কাণ্ড!—বালাই, ষাট!—শত্রুর পা মচ্‌কাক্…"

"শত্রুর পা মচকালে আমায় ছুটি দেবে কেন?"—বলিতে বলিতে তাড়াতাড়ি দু'টা কুলকুচি করিয়া ঘরে ঢুকিল।

দরখাস্তটি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, শৈল আসিয়া উপস্থিত হইল। হাতে দুইটা ভাঁজ-করা কাগজ, একটা ডাকের খাম। একটা কাগজ বিকাশের হাতে দিয়া বলিল, "সাধনদা' দিলে।"

সার্টিফিকেটটা পড়িয়া মুড়িয়া রাখিয়া বিকাশ দরখাস্তর বাকিটুকু শেষ করিতে লাগিল।

শৈল পিছনে একটু দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, "দাদা, এই খামটার ঠিকানাটুকু লিখে দেবে?—বৌদিদির…"

বিকাশ বিরক্তভাবে বলিল, "যা যা, জ্বালাতন করিস্‌নি কাজের সময়।"

তাহার পর আবার কি ভাবিয়া ফিরিয়া চাহিল; জিজ্ঞাসা করিল, "তা ও টিকিট-দেওয়া খাম কেন? আমি তো যাচ্ছিই; আমায় বুঝি বিশ্বাস হ'ল না?"

শৈল অনুযোগের নাকী সুরে বলিল, "তুমি বড় ভুলে যাচ্ছ ক'দিন থেকে; তাই বাবু তাকেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

বিকাশ আবার লিখিতে শুরু করিয়া বলিল, "অ পোড়ার মুখী।—যা, আমার দ্বারা হবে না···'বড্ড ভুলে যাচ্ছ'!"

একটু পরে শৈল তখনও পিছনে দাঁড়াইয়া আছে অনুভব করিয়া বলিল, "রেখে যা, যখন ফুরসুৎ হবে লিখে দোব।"

শৈল তাহার চিঠিটা আর খামটা সাধনের সার্টিফিকেটের সঙ্গে রাখিয়া আর একবার অনুরোধ করিয়া চলিয়া গেল, "দু'টি পায়ে পড়ি দাদা,—আহা, বৌদি বেচারি উত্তরের জন্যে হা-পিত্যেশ করে আছে গো।"

'সে বেচারি' কিসের জন্য যে হা-প্রত্যাশা করিয়া আছে ভাবিয়া বিকাশ মনে মনে একটু হাসিল। সেই সরসতার বশে খামটাতে বধূর নামটা লিখিল, ঠিকানাটা লিখিল, তাহার পর আফিসের খামটাতে ঠিকানাটা লিখিতে যাইবে, বাহিরে ডাক পড়িল, "বিকু আছিস্?"

বিকাশ প্রশ্ন করিল, "কে? সাধন নাকি?"

"পেয়েছিস্ সার্টিফিকেটটা?···দেখো, সেখানে গিয়ে যেন সত্যি সত্যি খোঁড়া হয়ে বসে থেকো না, আমাদের কাছে আবার ফিরে এসো ভালোয় ভালোয়।"

বিকাশ হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "কোথায় যাচ্ছিস্?"

"একটু পোস্টাফিসের দিকে।···আচ্ছা, আসি—একটু তাড়া আছে।"

বিকাশ ব্রস্তভাবে বলিল, "একটু দাঁড়া ভাই, হাফ্-এ-মিনিট্।"—তাড়াতাড়ি দরখাস্তটা মুড়িয়া ভাঁজ-করা কাগজের একখানা তাহার মধ্যে রাখিয়া খামে পুরিল, মুখটা বন্ধ করিতে করিতে বলিল, "এই এলাম বলে—এক সেকেণ্ড···"

কি মনে হইল, শৈলর দেওয়া খামেও অন্য ভাঁজ-করা কাগজটা ভরিয়া বন্ধ করিল, তাহার পর বাহিরে গিয়া দুইটা চিঠি সাধনের হাতে দিয়া বলিল, "একটু ফেলে দিস্, বড় আর্জেন্ট।"

সাধন খামটার উপর নজর ফেলিয়া হাসিয়া বলিল, "মানে—'মূর্চ্ছা যেওনা—আসছি'?"

বিকাশ হাসিয়া উত্তর করিল, "ওটা শৈলীর; আমারটা নিচে, আফিসের ঠিকানায়, তার বক্তব্য—'মরণে সব কলব পিষে, শর্মা এখন পাঁচ দিন আসছে না'!"

বি-পি. রেল হইয়া যাইতে হয়। গাড়ি স্টেশনে প্রবেশ করিতেই শ্বশুরকে অগ্রণী করিয়া একটি মাঝারিগোছের দল প্ল্যাটফর্মে জমিয়া উঠিল,—দু'টি শালা, তিনটি ছোট ছোট শালী, একজন খুড়তুতো ভায়রাভাই, আরও তিন চারিটি নূতন মুখ—বিকাশ চিনিতে পারিল না। দেখিল সবার মুখেই দারুণ উদ্বেগের চিহ্ন; সে হাসিতে গিয়া তাড়াতাড়ি মুখটা বিষণ্ণ করিয়া লইল, মনে মনে ভাবিল—"এ আবার কি ব্যাপার!"

নামিতে যাইবে, শ্বশুর তাড়াতাড়ি, "হাঁ-হাঁ, দাঁড়াও বাবাজি, দাঁড়াও!"—বলিতে বলিতে গাড়ির দোরের কাছে গিয়া তাহার ডান হাতটা শক্ত করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন; বড় ছেলেকে বলিলেন, "তুই বাঁ হাতটা ধর্, ভালো করে—দেখিস্…এইবার নাবো বাবা; দেখো, যেন হ্যাঁচকা-ট্যাচকা না লাগে। ঠিক ধরেছি তো আমরা? জোর পাচ্ছ? খু-ব আস্তে পা বাড়াও।"

বিকাশ মনে মনে বলিল—"হয়েছে, এ পোড়ারমুখী শৈলীর কাজ; কালকের চিঠিতে নির্ঘাৎ সার্টিফিকেটের কথাটা লিখে দিয়েছে।"…কিন্তু তখনই মনে হইল, তাহা হইলে তো মাত্র এইটুকু প্রকাশ পাইবে যে সে অফিসকে প্রবঞ্চনা করিয়া শ্বশুরবাড়ি আসিতেছে।…কিন্তু গুছাইয়া ভাবিবার সময়ও নাই—শ্বশুর-শালায় তাহাকে একরকম টাঙাইয়া ধরিয়াই তাহার নামিবার অপেক্ষা করিতেছে। শ্বশুরের প্রশ্নে বিকাশ উত্তর করিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, পাচ্ছি।"—অসংগতির ভয়ে আওয়াজটাও সাধ্যমত ক্ষীণ করিয়াই বলিল।

দুইজনে ধরিয়া ধরিয়া তাহাকে খানিকটা দূরে লইয়া গেল; তারপর তাহার বলিষ্ঠ শরীরের গুরুত্বের জন্য যেমন যেমন তাহাদের হাত ভারিয়া আসিতে লাগিল, বিকাশও নিজের পায়ের উপর নির্ভরতা বাড়াইয়া দিতে লাগিল। সেটা অনুভব করিয়া শ্বশুর একটু আশ্বস্তভাবে প্রশ্ন করিলেন, "খুব বেশি তাহলে লাগেনি বাবাজি, নয়?"

"আজ্ঞে না, ততটা লাগেনি।"

"ভগবান রক্ষা করেছেন; কিরকম করে চোটটা…?"

বিকাশ বোধ হয় নিরুপায়ভাবে মোটরের কথাই বলিতে যাইতেছিল, ছোট শালীটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থেকে বাঁচাইল—যদিও আরও এক গুরুতর সমস্যাই আনিয়া ফেলিল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্খানটায় লেগেছে, জামাইবাবু?"

বড়শালা ধমকাইয়া বলিল, "তোর সে-কথায় কাজ কি ছুঁড়ি ?—যা বস্ !"

বিকাশ স্বস্তির নিশ্বাস মোচন করিল।—আসলে, এত অল্প সময়ের মধ্যে কোথায় যে লাগিয়াছে সেটা তাহার ঠিকই করা হয় নাই এখনও ; বলিলেও একটা ফুলো কি আঁচড় দেখাইতে হয়, না-হইলে আফিস-প্রবঞ্চনার ব্যাপারটা বড় বিশ্রীভাবে স্পষ্ট হইয়া উঠে। সময় পাইয়া সে এই নববিধ বিপদ হইতে উদ্ধারের পথ খুঁজিতে লাগিল।

একটা গরুর গাড়ি অপেক্ষা করিতেছিল। অতিরিক্ত যত্ন এবং উৎকণ্ঠিত প্রশ্নাদির ভয়ে বিকাশ নিজে হইতেই খুব সাবধানে আরোহণ করিল। শ্বশুর প্রভৃতি কয়েকজন সঙ্গে রহিল, বাকি সকলে হাঁটিয়াই চলিল। মুখটা আর বিকাশকে চেষ্টা করিয়া বিষণ্ণ করিতে হইল না, বিস্ময়ে এবং দুশ্চিন্তায় আপনিই নিষ্প্রভ হইয়া রহিল। একটু পরে শ্বশুর সামান্য একটু ভাঙিলেন কথাটা, কিন্তু তাহাতে ব্যাপারটার চারিদিকে কুহেলিকা ঘনীভূতই হইল মাত্র।—

"তোমার শাশুড়ী তো কেঁদেই খুন—বলে, 'কেন যাচ্ছ বাপু ইস্টিশানে ঘটা করে—বাছা কি আমার আসতে পারবে ?'—আমারও তাই মনে হচ্ছিল, তবুও সাহস দিয়ে বললাম,—'তার খুড়োর চিঠি পেয়েছি বিকাশ আসবে, আজ সকালের এ চিঠিটা কিছুই নয়'···বললাম বটে 'কিছু নয়'—এদিকে কিন্তু আমার নিজেরই খটকা লেগে আছে—খামকা লিখতেই বা গেল কেন আঘাতের কথাটা ?···"

বিকাশ ঘাড় বাঁকাইয়া শ্যালককে ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল, "কৈ, আমার তো একেবারেই কিছু লাগে নি। মনেই পড়ছেনা যে···"

শ্যালক প্রশংসার মৃদুহাস্য করিয়া বলিল, "আপনাদের হ'ল ফুটবল-খেলা হাড়, ওসব চোটকে বড় একটা আমল দেন কিনা !"

বিকাশ নিরাশ হইয়া চুপ করিয়া গেল, বুঝিল আপাততঃ শ্যালকের ভগ্নীপতি-গৌরব ডিঙাইয়া প্রকৃত কথাটা বুঝিবার বা বুঝাইবার চেষ্টা বৃথা।

ভায়রাভাই মুখটা আগাইয়া আনিয়াছিল ; বিজয় দর্পে ফিস্‌ফিসানিতেই বিসর্গ যোগ করিয়া শ্যালককে বলিল, "আমি বললাম না—ওটা ঠাট্টা ? সময়ে আজকাল ঐ সব ধরণের ঠাট্টা চালু। কে লিখলে, কি অর্থ, এটা যদি চট্ করে ধরাই পড়লো তো আর মজাটা কি হ'ল ?···কি বলুন বিকাশ-দা ?"

ধরা না-পড়িবার মজা বিকাশ হাড়েহাড়েই অনুভব করিতেছিল, স্পষ্ট কিছু না বলিয়া একটু হাসিল মাত্র। ভায়রাভাইকে একটু স্বপক্ষে পাইয়া প্রকৃত তথ্যটা বাহির করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি তাহ'লে পড়েছিলেন চিঠিটা মদনবাবু?—কি লেখা ছিল বলুন তো?"

ভায়রাভাইটি যাহাকে বলে একটু আহ্লাদে গোছের। সৌজন্যে গদগদ হইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, "আমাকে 'আপনি' বলে লজ্জা দেওয়া কেন? আবার মদন বা—বু!—ধ্যা্‌ৎ!"

সৌজন্যের চাপে দরকারি কথা মারা যায় দেখিয়া বিকাশের মুখটা বিরক্তিতে কুঞ্চিত হইয়া আসিতেছিল, সামলাইয়া একটু হাসিয়া বলিল, "তা'তে কি হয়েছে? বলুন না।"

ভায়রাভাই একটু দোল খাইয়া আব্দারের সুরে হাসিয়া বলিল, "না, কক্ষনও বলবোনা; আগে 'তুমি' বলুন..."

বিকাশ তাহাকে মনে মনে 'তুমি'র চেয়ে ঢের নিম্নস্তরের শব্দে অভিহিত করিয়া তাহার সঙ্গে গোটাকতক অকথ্য গালাগালও জুড়িয়া দিল। এ অবস্থায় যতটা সম্ভব হাসিমুখ করিয়া বলিল, "আচ্ছা, শুনিই না, চিঠিটা পড়া হয়েছিল কিনা?"

"ঐ দেখুন, এড়িয়ে গেলেন; ভারী চালাক, ইস্!"—বলিয়া ভায়রাভাই নিজের চতুরতায় হাসিয়া উঠিল।

গোড়া থেকেই মন ভালো নয়, তাহার উপর এই ন্যাকামির অত্যাচার,—বিকাশের ডান হাতটা একটা শক্ত মুঠায় পাকাইয়া উঠিল। ভায়রাভাইয়ের প্রার্থিত অলৌকত্বটা কোথায় গিয়া পৌঁছিত বলা যায় না, শ্বশুরের কথায় ব্যাপারটা অন্যদিকে ঘুরিয়া গেল।

বলিলেন, "নেবে বাড়িতে ঢোকবার সময় বাবাজী, যতটা পারো সহজ ভাবে চলবার চেষ্টা কোরো, নাহ'লে তোমার শাশুড়ী-এরা কেঁদেকেটে অনর্থ করবে; অথচ আবার যেন এমন ভাবে লুকোতে যেও না, যাতে, আমরা যারা জানি, তাদের ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়। বুঝলে তো?"

বিকাশের একবার মনে হইল—এই শেষ সুযোগ; আরম্ভও করিল, "কিন্তু বাবা, আমার যখন...?"

শ্বশুর মুখের কথা কাড়িয়া বলিলেন, "হাঁ বাবা, যা বলবে তা' বুঝেছি বইকি।—তার আর কি করবে?—নিরুপায়—"

বিকাশ হতাশভাবে মৌনতা অবলম্বন করিয়া শ্বশুরের কথার মানেটা বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন সময় একটা মোড় ঘুরিয়া গাড়িটা বাড়ির সদরে দুইটা ধানের মরাইয়ের মাঝখানটায় আসিয়া হাজির হইল।

এক পাল নানাবয়সের স্ত্রীলোক, ছোটবড় অনেকগুলি ছেলেমেয়ে—খোঁড়া বর দেখিবার উৎসাহে যে দলটা একটু বেশিরকম পুরু হইয়াছে, বেশ বোঝা যায়। সকলের মুখটা আশা এবং ঔৎসুক্যে যেন দীপ্ত হইয়া আছে।

মাঝখানে শাশুড়ী,—অঞ্চলে মুখ, নাক আর চোখের খানিকটা ঢাকিয়া পূর্ব হইতেই কাঁদিতেছিলেন। স্বামী আর পুত্র নামিতেই কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আর নিজেকে সামলাইতে পারিলেন না: "জোড়ের পর শ্বশুরবাড়ি এলো বাছা কিনা খোঁড়াতে খোঁড়াতে!"—বলিয়া এমন উচ্ছ্বসিতভাবে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন যে তাহার অর্ধমাত্রই চাপা থাকিতে পারিল।

স্বামী একটু বিরক্তভাবেই বলিলেন, "ওগো, না গো না, তেমন কিছু লাগেনি; কৈ খোঁড়াচ্ছে?—দেখ দিকিন চোখ মেলে?..."—বলিয়া গাড়ির পিছনে দাঁড়াইয়া খুব সতর্কদৃষ্টিতে বিকাশের পায়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন। খোঁড়ায় কিনা দেখিবার জন্য চারিদিককার দলটা আরও আগাইয়া আসিয়া বিকাশ যেখানটায় নামিবে সেখানটা ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ভিড়ের মধ্যে বেশ একটু ঠেলাঠেলি পড়িয়া গেল।

বিকাশের নামিতে একটু দেরি হইতেছিল, হইবারই কথা, কেননা খুব সহজ, সুস্থ পায়ে জোর করিয়া সহজভাবে চলিবার মতো শক্ত অভিনয় আর নাই, বিশেষ করিয়া এতগুলি সমালোচকের সম্মুখে। তাহার উপরও বিপদ এই যে, ফরমাসী 'সহজ'-এর মধ্যে কতটা আবার ন্যাংচানো ভাব মিশাইলে ওদিকে শ্বশুরমহাশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িবেন না—সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই ব্যস্ত হইয়া পড়িবার মর্মও তাহার অজ্ঞাত ছিল না—অর্থাৎ একেবারে বেপরোয়া ভাবে চলিতে গেলে সেটা কৃত্রিম ভাবিয়া শ্বশুর, শালা সবাই আসিয়া তাহাকে আবার টাঙাইয়া তুলিবে। শ্বশুর-শাশুড়ীকে একসঙ্গে সন্তুষ্ট করার এই দারুণ দুশ্চিন্তায় পড়িয়া বিকাশ একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল, শাশুড়ী কান্নার আর একটা উচ্ছ্বাসে ভাঙিয়া পড়িয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "বাছা আমার যে নাবতে পারছে না গো!—এগিয়ে ধরো না গিয়ে? তোমারও কি এখন তামাশা দেখবার সময় হ'ল?

বিকাশ সহসা আবার কি ভাবিয়া যেন মরিয়া হইয়াই একটা কাণ্ড করিয়া বসিল।—সাহায্য আসিবার পূর্বেই একরকম লাফাইয়াই নামিয়া পড়িল এবং সাধ্যমত জড়তাটা কাটাইয়া শাশুড়ীকে গিয়া প্রণাম করিল। তাহার পরে বেশ সিধা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আমার তো মা কিছুই হয়নি এই দেখুন না; আপনারা মিছিমিছি ভাবছেন।"



'বাছা আবার যে নাবতে পারছে না গো!'

সব হঠাৎ হইয়া গেল বলিয়া বোধ হয় শ্বশুর "ব্যস্ততার" কোন লক্ষণ দেখাইবার অবসর পাইলেন না, মনে মনে শুধু জামাইয়ের কষ্টসহিষ্ণুতার প্রশংসা করিলেন—আহা! তাঁহারই উপদেশ পালন করিবার চেষ্টায় এই নিয়েছে তো! শাশুড়ীও বুঝিলেন জামাই তাঁহার দুশ্চিন্তা লাঘব করিবার জন্য হাসিমুখে আত্মনির্যাতন সহ্য করিতেছে—আহা, এমন জামাই! চোখে আবার

বক্তা নামিল, বলিলেন, "তাই হোক বাবা, আমাদের ভাবনা মিছেই হোক্... কি করে লাগলো বাবা, বিকাশ? হাড় কি দুখানা হয়ে গেছলো? কবে হাঁসপাতাল থেকে ফিরলে সেখানে?..."

আর বলিতে পারিলেন না, উচ্ছ্বসিত অশ্রু চাপিতে চাপিতে হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে জামাইকে চালাইয়া লইয়া চলিলেন। বিকাশ একেবারে হাল ছাড়িয়া দিল।

কর্তা উগ্র হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "হাড় দু'খানা হ'তে যাবে কেন? ভালো জ্বালাতন! আর হাঁসপাতালে গিছলো এ খবর আমায় কে দিলে তোমায়? হাড় দু'খানা হয়ে গেলে ওরকম চলতে পারে কোনে? না, বাড়ি ছেড়ে এতদূর..."

হঠাৎ কি ভাবিয়া চুপ করিয়া গেলেন।

গিন্নী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি ক্ষ্যামা দাওতো বাপু; পাষাণ!... তোমার ভয়ে ছেলেটা ভালো করে সহজভাবে চলতে গিয়ে কি কষ্টটাই যে সহ্য করছে তা বোঝবার তোমার ক্ষ্যামতাই নেই!"

দাঁড়াইয়া বলিলেন, "না বাবা, তুমি খুঁড়িয়েই চলো একটু, আমার মাথা খাও। পা-ধন বড় ধন, জবরদস্তি করে কাজ নেই কারুর ভয়ে। আমার অদিষ্টে যখন নেকাই আছে আজ এই দেখবো, তখন তুমি আর কত সামলাবে বাবা?"

ভায়রাভাই আগাইয়া আসিল এবং তাহার আসল অভিমতটা যাহাই হোক্, আপাততঃ বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়িয়া বলিল, "তবু যে এমন পা নিয়েও এসেছেন আমাদের মনে করে..."

বিকাশের চোখে দৃষ্টি পড়ায় থামিয়া গেল।

ছেলের দল নিরাশ হইয়া পাতলা হইতেছিল, একজন ছুটিয়া বাহির হইয়া চাপা গলায় বলিল, "এই! দেখসে সব, এবার খোঁড়াবে, রাঙাখুড়ী দিব্বি দিয়েছে..."

কর্তা ধমক দিয়া উঠিলেন, "তোরা যা দিকিন্ সব,—তামাশা পেয়েছে!... শোন কথা,—ভয়ে খোঁড়াচ্ছে না! তাহ'লে ভয়ে তুমি কান্নাও বন্ধ করে দিচ্ছে..."

গিন্নী সহানুভূতিতে রুদ্ধবাসা একজন বর্ষীয়সীকে কহিলেন, "দেখছো তো ভাবদিদি?—এইটে বগড়ার সময় হ'ল—দোরে জখম জামাই!...কুকুলে কি হবে?—রেল থেকে কি করে যে চ্যাংদোলা করে বাপে-বেটায় নিয়ে এসেছে, তা কি...ও মাগো!"

আবার খানিকটা অশ্রুনিকাশ করিয়া বুকটা হাল্কা করিয়া বলিলেন, "চলো বাবা, ভাঙা পা'টিকে আল্‌গা করে চলো…"

বিকাশ শৈলর উপর মনে মনে "গর্জ্জাইতেছিল—বাড়ি ফিরিয়া তাহাকে আস্ত পুঁতিবে। কিন্তু আপাততঃ যখন উপায়ই নাই, তখন কি ভাবে কতটা আল্‌গা করিবে পা'টাকে তাহাই ভাবিতে লাগিল। শাশুড়ী বলিলেন, "চলো বাবা; কাত্তদিদি, তুমি নাহয় ভাই ওদিকটা ধরো…হ্যাঁ…এইবার চলো। তো ধন আমার…আহা, জোড়ে এসে কেমন হাসিমুখে ফিরে গেল বাছা আমার, আর আজ বাছার শুকনো মুখখানির দিকে চেয়ে যে চাইতে পারা যাচ্ছে না গো!"

ভায়রাভাই জ্যেষ্ঠশাশুড়ীর সাহায্যে আসা সমীচীন বোধ করিল। সামনে আসিয়া বলিল, "চলুন না বিকাশদা; নিজের বিয়ে-করা শ্বশুরবাড়িতে নেংচে নেংচে ঢুকবেন, তা'তে লজ্জা কি? এতো আর—এতো আর…"

কোথায় ল্যাংচোনায় লজ্জা হওয়াটা স্বাভাবিক তাহার একটা যুৎসই উদাহরণ না পাইয়া থামিয়া গেল। তারপর নিরুপায় বিকাশ খোঁড়াইতে আরম্ভ করিলে উৎসাহিত করিবার জন্য দক্ষিণ হস্তের চেটোটা তালে তালে ঘুরাইয়া বলিল, "এই তো, বাঃ! আর আপনি তো আর সাধ করে খোঁড়াচ্ছেন না বিকাশদা, যে…আর জেঠাইমাও মনে করছেন ঘরের ছেলে ঘরে তুলছি…"

চৌকাঠের নিকট আসিতে শাশুড়ী চোখ মুছিয়া স্নেহজড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "সোয়াস্তি পাচ্ছ নাকি বাবা?"

বিকাশ শ্রান্তকণ্ঠে বলিল, "অনেকটা।"

গিন্নী মুখটা একটু কুঞ্চিত করিয়া পাষাণহৃদয় স্বামীর দিকে একটা কটাক্ষ হানিলেন।

* * * *

প্রথম অভ্যর্থনার হিড়িকটা কাটিয়া গেলে কথাবার্তায় বিকাশের নিকট অবশ্য আসল ব্যাপারটা ক্রমশঃ প্রকাশ হইয়া পড়িল।—আজ দুপুরের ডাকে শৈলর চিঠির পরিবর্তে সাধনের সার্টিফিকেটটা আসিয়া হাজির হইয়াছে। ইহাতে শৈলর উপর হইতে রোষটা সরিয়া যাওয়ায় মনটা আরও যেন তিক্ত হইয়া উঠিল। একবার ভাবিল,—"সাধন হতভাগাটা ঠিক সেই ভাবের ঘ্যাবাটিতে এসে যদি তাড়াহুড়ো করে খামের গোলমাল না বাধিয়ে দিত…"। কিন্তু তাহাতেও স্থায়ী সান্ত্বনা পাওয়া গেল না। ওদিকে আবার অফিসে

সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শৈলর চিঠি গিয়া কি অঘটন ঘটাইতেছে তাহাই বা কে জানে ?...

এখানে পত্রটার অসংগতি ধরিবার-মতো যখন কাহারও ঘটে বুদ্ধি নাই, তখন সে আর বোকার ভুলটার কথা ভাঙিল না। শুধু বলিল, "সাবনের এ ডাক্তারিগিরি ফলাতে যাওয়া কেন ?...নতুন পাশ করেছে কিনা—তাবলে জানিয়ে খুব বাহাদুরি করলাম !—একটু লেগেছিল সামান্য, ভাবলাম সেখানে থাকলেই তো খেলাধূলো, আফিস,—তাই দু'টো দিনের ছুটি নিয়ে এলাম চলে।"

শাশুড়ী চোখ মুছিয়া বলিলেন, "বেশ করেছ, বাবা।"

ভায়রাভাই বলিল, "আর বাড়ি আর শ্বশুরবাড়ি কি আলাদা ভাবতে আছে !—বলুন না জেঠাইমা !—কথাতেই তো বলে, যে..."

কি যে বলে মনে না পড়ায় চুপ করিয়া রহিল।

শ্বশুরবাড়ির অত সাধের আদর-যত্ন—সব জড়ো হইয়াছে ডান পায়ের হাঁটুতে। জামাইয়ত্বের বাকি সবখানি পড়িয়া গিয়াছে দারুণ অবহেলায়! মনে সুখ নাই মোটেই।

খোঁড়ানোটা ক্রমে ক্রমে কমাইয়া আনিয়া পরের দিন সন্ধ্যাবেলা বিকাশ বলিল, "কালই তবে যাই, আফিসের ছুটিটা পেলাম কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না,—নতুন চাকরি..."

শ্বশুর বলিলেন, "ডাক্তারবাবু লিখেছেন পূর্ণ বিশ্রাম নিতে এক হপ্তা।"

এত দুঃখতেও বিকাশের হাসি পাইল। তখনই আবার ভাবিল—অজ্ঞ চাষাভূষাগোছের শ্বশুর না হইলে তাহারই ছিল আজ আরও লজ্জায় পড়িবার পালা।

বলিল, "বলেছিল বটে; কিন্তু মা যে কি চমৎকার ওষুধ সব দিয়েছেন, আবার তো আজই যেন পনরো আনা কমে গেছে বলে বোধ হচ্ছে।

কতদিন পরে এই যেন একটু খুৎসই কথা কহিল।

শাশুড়ী স্মিত হাস্য করিয়া বলিলেন, "ও আমার দিদিমার দেওয়া ওষুধ। এদের এখেনে হুড়োহুড়ি করেন বলে কি ও যা-তা ?...তা' কাল আর নয়, পরশু তখন যা হয় হবে। চাকরির কথা কি আর বলবো বলো ? কিন্তু খোঁড়া-যাত্রা মিটিয়ে আবার একবার এসো শীগ্‌গির, বাবা..."

[বিচিত্রা, আষাঢ় ১৩৩৩]

বিড়ম্বনা

বরযাত্রী আসিয়াছে নবদ্বীপ হইতে। আর সব যেমন আথচার হয়,—অস্বাভাবিক রকম তারিকে বরকর্তা; শিঙি মাছের মতো কালো, লিক্‌লিকে নাপিত; ঘাড়-কামানো চ্যাংড়া, পেশাদারী বরযাত্রী ছোকরার দল—চায়ে এলে না, খোসামোদে গলে না; বরও তোমার-আমারই মতো—নেহাৎ আটপৌরে গোছের। তবে পুরুত আসিয়াছে নাকি মহা এক দিগ্‌গজ পণ্ডিত।

মুণ্ডিত মাথায় সুপুষ্ট শিখা, শীর্ণ দীর্ঘ দেহ; নামাবলী গায়ে, খড়ম পায়ে অনাচার বাঁচাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এক একটা সংস্কৃত বুলিই বা কি, তার উচ্চারণই বা কি! নস্যতে পর্যন্ত যেন একটা টুলো সংস্কৃত-সংস্কৃত গন্ধ, নাকে ঠুসিয়া দিয়া হাতে তালি দেন—যেন বিসর্গ ঝরিতে থাকে।

গ্রামের মাতব্বরেরা আসিয়া আলাপ করিয়া গেল। মাতব্বরদের মাতব্বর শিবনিবাস, রায়চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া আগে খানিকটা ডাইনে বাঁয়ে মাথা দুলাইয়া লইয়া, ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া বলিলেন, "না, ন্যায়ালংকার মশাইয়ের বিদ্যের থই নিতে হ'লে ডুবুরি নামাতে হয়।"

সকলের মুখ সম্ভ্রমে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; শিবনিবাসের মুখেই যখন এই কথা!—এক ইংরেজী কেতাবই যাহার অল্প করিয়া ধরিলেও তিন চারখানা পড়া আছে। হরু চক্রবর্তী রামলোচন ভট্টাচার্যকে একটু ঠেলিয়া বলিল, "যাও না হে ভট্‌চায্‌, একবার আলাপ-পরিচয়টা করেই এসো না, গ্রামের মুখ রাখতে তো তুমিই; অত বড় একটা বিচক্ষণ পণ্ডিত এসেছেন…"

সকাল থেকে এই রকম প্রশংসা শুনিতে শুনিতে রামলোচনের মেজাজ নিতান্ত খিঁচিয়া হইয়া ছিল, হুঁকা থেকে মুখটা ছিনাইয়া খ্যাক্ খ্যাক্ করিয়া উঠিল, "আরে ন্যাও ন্যাও! যেনো ভট্‌চায্‌ ও রকম ঢের ঢের নেড়ালংকার দেখেছে; তোমরা দেখনি কখন, হ্যাংলার মতো ঘিরে বোসো গে।…আমি সেধে যেতে গেলাম কেন না? বলে, আমার শিমুকে এক একটা উইয়ের পেটে যা দিয়ে আছে তা হজম করতে ওরকম ন্যায়ালংকারের দশটা মাথা ফেটে যায়, হুঃ…"

সত্যই তো, কৃষ্ণচন্দ্র রাজার সভাপণ্ডিত জগন্নাথ তর্কচূড়ামণির বংশধর; শিমুল ফুটিয়া যখন তালপাতার পুঁথি শুকায় তখন উহাঁদের বাড়ীই আহির হয় আজও।

সের করিয়া! কয়েকজন সমর্থন করিয়া বলিল, "হ্যাঃ, ঠিকই তো, কেন গায়ে পড়ে আলাপ করতে যাবে? বংশমর্যাদা বলে একটা জিনিস আছে তো?"

প্রসন্ন কবিরাজ রোগীর নাড়ি টিপিবার সময় প্রায়ই দু'একটা সংস্কৃত শ্লোক আওড়ায় এবং সেই সূত্রে গ্রামের পণ্ডিতির আসনটা লইয়া তাহার রাম-লোচনের সহিত রেষারেষি আছে। উঠিয়াই যাইতেছিল, একটু ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তাহ'লে বিকেলের দিকে কথাবার্তা কইতে কইতে ন্যায়ালংকার মশাইকে নাহয় তোমার ওখানেই নিয়ে আসা যাবে'খন।"

রামলোচন একটা তির্যক দৃষ্টি হানিয়া বলিল, "তুমি বুঝি টের পেয়েছ আমার বৈকালে একবার কানাইদহে যেতে হবে আজ?"

"ও!...রাত্তিরে কিন্তু ফিরবে তো?"

রামলোচন কোন উত্তর দিল না, হুঁকার উপর বাঁ হাতটা আরও কষিয়া ধরিয়া ঘনঘন তামাক টানিতে লাগিল।

উঠানের মাঝখানে চাঁদোয়া টাঙাইয়া তাহার নিচে বিবাহ হইতেছে। চারিদিকে লোকের ভিড়, কতক বসিয়া, কতক দাঁড়াইয়া। সব বয়সের লোক, তবে যুবকের ভাগ এখন কম; তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন দলের চর আসিয়া মাঝে মাঝে দেখিয়া যাইতেছে—স্ত্রী-আচারের খবর পাইলেই তাহারা আসিবে। শাপত্র বন্ধ করিয়া বুড়াদের মধ্যে বসিয়া নাহক অং-বং শোনা পোষায় না।

পুরুতদের মধ্যে খিটিমিটি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সাক্ষাৎ হইতেই ন্যায়া-লংকার মহাশয় প্রকাণ্ড এক সংস্কৃত শ্লোক ঝাড়িয়া কন্যাপক্ষের পুরোহিতকে অভিনন্দিত করেন,—বোধ হয় অভিনন্দিতই করেন, কেন না তাহাতে সাপ ছিল কি ব্যাং ছিল রামলোচন কিছুই ঠাহর করিতে সমর্থ হয় নাই। শ্লোকের অর্ধপথেই হঠাৎ একটি ছোট ছেলের মাথায় হাত দিয়া আদর করিয়া সে মোহাড়াটা সামলাইয়া লইয়াছে বটে, কিন্তু ভয়ে একেবারে কাঠ হইয়া আছে এবং সেই জন্য রাগে ক্রমশঃ মরিয়া হইয়া উঠিতেছে।

"না, না, ওকি হ'ল ভট্টাচার্য!...ওটুকু এইভাবে করতে হবে যে..."

রামলোচন কখনও নীরবে মানিয়া লইয়া সংশোধনটুকু সারিয়া লইতেছে, কখনও বলিতেছে—"উভয় প্রকারই হয়," কখনও বা একটু রুখিয়াই জবাব দিতেছে—"এ-গ্রামে এইটিই পদ্ধতি।"

"পদ্ধতি!"—ন্যায়ালংকার সিধা হইয়া বসেন, মুখে ব্যঙ্গের হাসি [illegible]

—"ভট্টাচার্য মহাশয়, সূর্য যেমন গ্রহ-উপগ্রহাদি সমস্ত উদ্ভাসিত করেন, এক নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী সেইরূপ আসমুদ্রহিমাচল সারা বঙ্গদেশের উপর সর্ববিধ শাস্ত্রীয় বিধানের আলোকসংপাৎ করেন। এতদিন যদি এখানে এই অশাস্ত্রীয় পদ্ধতিই চলে এসে থাকে তো বৈদিক আচার লুপ্ত হয়েছে, বেদ অবমানিত হয়েছেন বলতে হবে!"—দুই চক্ষু অনল বর্ষণ করে, নস্তের সাধারণ টিপে কুলায় না।



'পদ্ধতি!...'

রামলোচনের মুখ রাঙা হইয়া উঠে, তাহার পর কালো হইয়া যায় যখন কবিরাজ বলে, "হ্যা, হ্যা, রামলোচন, আমাদের পরম ভাগ্য যে ন্যায়ালংকার মশাইদের পায়ের ধুলো পড়েছে, ভুলভ্রান্তিগুলো সব শুধরে নাও; অবশ্য এত যুগের একদিনে যাবার নয়, তবু..."

ভিড় জমিয়া উঠিতে লাগিল। এক কন্যাকর্তা শুধু উত্তরোত্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছেন, আর সকলেরই আশা আজ শেষ পর্যন্ত একচোট টিকি ছেঁড়াছেঁড়ি চলিবে। আপাততঃ রামলোচনের মন্ত্রের সূত্র ক্রমাগতই ছিন্ন হইয়া যাইতেছে এবং ন্যায়ালংকার যে পরিমাণে সাহায্য করিতে তৎপর হইতেছেন, প্রহিতে সেই পরিমাণে বেশি জট পাকাইয়া যাইতেছে মাত্র।

এইরূপ পুরোহিতদের বিরোধের মধ্য দিয়া বিবাহের বিলনের কার্যটা আগাইয়া চলিল। রামলোচন খুব সাবধানে অগ্রসর হইতেছে; অর্ধেকটা মন রহিয়াছে মন্ত্র পড়ানো আর আত্মরক্ষার দিকে। অর্ধেকটা অপর পক্ষের ছিদ্রান্বেষণের দিকে—একটা কিছু ভুল হইলে হয়, এতটুকু স্খলন—সুদে আসলে সব তুলিয়া লইবে, তবে তাহার নাম রামলোচন ভট্চায্।

সম্প্রদান আসিয়া পড়িল। রামলোচন আগের মন্ত্রটির অনুস্বার-বিসর্গে একটা ভৈরব টংকার দিয়া আসনের উপর পা দুইটা গুটাইয়া লইয়া বলিল, "নাও, এইবার আসল কাজ; মেয়েটিকে খাইয়ে পরিয়ে এতদিন মানুষ করলে, এইবার পর করে দাও হে অবিনাশচন্দ্র।…এটা হ'ল বাপের নাড়ি কাটা—" ব্যবসায়গত এই রসিকতাটুকু করিয়া ন্যায়ালংকার মহাশয়ের দিকে চাহিয়া একটু স্মিত হাস্য করিল।

কৎবেলের নস্যাধারে দুই তিনটা টোকা মারিয়া ন্যায়ালংকার বলিলেন, "নিজের হাতে নিজের নাড়ি কাটা"—বলিয়া আর কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়াই নিজের রসিকতায় প্রবল অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

"অতি সমীচীন কথা, অতি সমীচীন কথা! পণ্ডিতের যোগ্যই কথা!" —বলিয়া রামলোচনও হাসিতে লাগিল; চেষ্টাপ্রসূত বলিয়া হাসিটার জোরও হইল বেশি এবং অনেকক্ষণ স্থায়ীও হইয়া রহিল।

কৎবেলটা আগাইয়া ন্যায়ালংকার বলিলেন, "আসুন, নস্য…"

গ্রহণ করিয়া বাঁ হাতে ঢালিতে ঢালিতে রামলোচন বলিল, "বাঃ, কাশীর নিশ্চয়ই; দেখেই চেনা গেছে।…অমন নস্য আর ভূ-ভারতে…"

"নাঃ, এ খোদ নবদ্বীপের। আমার ও আপনার কাশীটাশীর নয় তেমন…"

"নাঃ, বাঁধলো না, ভাব করে ফেললে"—বলিয়া কতকগুলা ছোকরা নিরাশ হইয়া বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল; রামলোচন বলিল, "মন্দ নয়, তবে কাশী-

নবদ্বীপে প্রভেদ আছে বৈকি—কথায় বলে বারাণসীধাম, শিবের ত্রিশূলের উপর যার স্থিতি…”

ন্যায়ালংকার একেবারে গর্জিয়া উঠিলেন, “নবদ্বীপের মহিমা অর্বাচীনে কি জানবে?”

“কাশীর নিন্দা এক মূর্খের মুখেই শোভা পায়!—রামলোচন গলার চাদরটা কোমরে জড়াইবার উপক্রম করিয়া ঠেলিয়া উঠিল।

“লেগে গেছে!”—বলিয়া ছোকরার দল সানন্দে ফিরিয়া আসিতেছিল, বয়স্ক লোকেরা মিলিয়া দুইজনকে থামাইয়া দিল। ছোকরারা একটু চেষ্টা করিল; দু'একজন একটু পাশে গিয়া গলা চড়াইয়া বলিল, “হ্যাঃ, ভারি তো কাশী, একটা ত্রিশূলের ডগায় টিম্‌টিম্ করছে…”

দু'একজন উত্তর দিল, “যা-যা, রেখে দে তোর নবদ্বীপ…”

ধমক-ধামক দিয়া তাহাদেরও সরাইয়া দেওয়া হইল।

রামলোচন কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, “নাও, মালাটা দু'জনের হাতে একটু ভালো করে জড়িয়ে দাও…নবদ্বীপের নিকুচি করেছে…বলো—সবস্ত্রং —সালংকারাং—প্রজাপতিদেবতাকা—র্চিত—মেনাং কন্যাং—আমহং সম্প্রদদে …ত্রিপত্র আর তিলশুদ্ধ জল হাতের ওপর ছিটিয়ে দাও…নিন্, আপনি বরকে বলান এবার…”

“মন্ত্র অশুদ্ধ।”—বলিয়া ন্যায়ালংকার হাত-পা আসনের উপর গুটাইয়া লইয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন।

“অশুদ্ধ!”—রামলোচনের বাঁ হাতের নস্যের টিপটা আস্তে আস্তে ঘুঁসিতে রূপান্তরিত হইল।

“অশুদ্ধ—'আমহং' নয়, ওটা 'তুভ্যমহং' হবে;—তত্র বিভক্তি দোষাৎ। 'সম্প্রদানে চতুর্থী'—একটা দুগ্ধপোষ্য শিশুও এ-সূত্রটা অবগত। নবদ্বীপের বর ও-মন্ত্র অগ্রাহ্য করলে; ও ওর বোধাতীত, ধারণাতীত।”

সমস্ত সভা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। দু'একজন ছোকরা বাহিরে দৌড়াইয়া গেল,—তাহারই যা' একটু শব্দ। রামলোচনের দু'টা হাতই মুষ্টিবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, একটা কিছু করে করে, ঠিক এমন সময় তাহার মুখটা হঠাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, মুঠা দু'টাও শিথিল হইয়া গেল। শান্ত, শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, “কত্র দোষাৎ? সম্প্রদানের সময় কি করতে হবে বললেন?”

সংস্কৃতের বহর দেখিয়া ন্যায়ালংকার আর সংস্কৃতে উত্তর দিলেন না, বলিলেন, "শুদ্ধ বিভক্তির অভাবে অমার্জনীয় ভ্রম হয়েছে—দ্বিতীয়া হয় না।"—চাপা কণ্ঠে একটা অস্ফুট শব্দ হইল—"মূর্খ।"

"বিভক্তির অভাবে ভ্রম! তাও আবার অমার্জনীয়!"—রামলোচন গভীর বিস্ময়ে অনেকক্ষণ ন্যায়ালংকারের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, একবার দক্ষিণ হাতটা অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, "আপনারা এখানে প্রায় পাঁচখানা গ্রামের ভদ্রলোক উপস্থিত। অর্বাচীন, মূর্খ এক সামান্য পুরোহিতের একটা নিবেদন দয়া করে শুনতে হবে। ন্যায়ালংকার বলে পরিচয় দিয়ে যিনি আজ পুরুতের আসন দখল করে বসেছেন, তিনি এ-পর্যন্ত অনেক তর্কের কথাই মাঝে মাঝে তুলে গেছেন। সে-সব শাস্ত্রীয় কথা বলে ইতর-সাধারণের বোধগম্য নয়, তাই সে-সব কথা আর তুললাম না, এমন কি ওঁরা আমাদের অভ্যাগত বলে দু'একটা ছোটখাট কথা ভদ্রতার খাতিরে যে মেনেও নিয়েছি তা আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন। এতক্ষণ আমি ন্যায়ালংকার মশাইয়ের বিদ্যের এমন একটা নমুনা খুঁজছিলাম যাতে আপনাদের সকলেই এক কথায় তাঁর পরিচয় পেয়ে যেতে পারেন তা এতক্ষণে পেয়েছি।...ন্যায়ালংকার বলছেন—মন্ত্রে বিভক্তির অভাবে ভ্রম হয়েছে। কথাটা খুব ভালো করে শুনুন আপনারা,—বি-ভ-ক্তির অভাবে ভ্রম। আচ্ছা, এইবার আমি জিজ্ঞাসা করি···না, এখানে সবাই বেটাছেলে—অল্প-বিস্তর সবাই শিক্ষিত; বাড়ির মধ্যে থেকে কোন একজন প্রাচীনাকে ডেকে দিতে হবে।—অবিনাশের মা-ই আসুন, তাঁর চেয়ে আর প্রাচীনা কে আছে?···যাও হে অন্নদাচরণ, আমার নাম করে জেঠাইমাকে ডেকে নিয়ে এসো—বলবে একটা সমস্যা পূরণ তাঁকে করে দিতে হবে; নবদ্বীপের ন্যায়ালংকার মশাই ন্যায়-অন্যায়ের এক মহা সমস্যা তুলেছেন।"

চাপে চাপে ভিড়; কিন্তু একটুও টুঁ-শব্দ নাই। ন্যায়ালংকারও একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া আছেন। একটু পরেই অন্নদাচরণের পিছনে পিছনে একজন প্রায় অশীতিপরা বৃদ্ধা আসিয়া এক পাশটিতে দাঁড়াইলেন। পরণে থান কাপড়, কপাল পর্যন্ত ঘোমটা; কিন্তু প্রায় সকলের চেয়েই বড় বলিয়া ওরই মধ্যে বেশ সপ্রতিভ। তিনিই প্রথমে কথা কহিলেন, "বলি, হ্যাগা রামলোচন, বিয়ে দিতে এসে এসব কি বিশ্রি?—কথা কাটাকাটি চলবে শুনছি? একটা অমঙ্গল না ঘটিয়ে···"

রামলোচন নিতান্ত মিনতির স্বরে বলিল, "আমি তো, জেঠাইমা, কোন কথাই তুলি নি ; মুখ্যুসুখ্যু গেঁয়ো পণ্ডিত, যেমন ভবনেশের বিয়ে দিয়েছি, অন্নদার দিয়েছি, তেমনি জ্ঞান নিয়ে তাদের ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিচ্ছি। তবে এই ন্যায়ালংকার মশাই মহা এক সমস্যা তুলেছেন—সেটা মীমাংসা না করে দিলে আমি আর এগুতে পারছি না—গেরস্তর মঙ্গল-অমঙ্গলের কথা কিনা।"

ভীতকণ্ঠে উত্তর হইল, "ওমা, কি সব্বনেশে কথা! তা আমি মেয়েমানুষ তা'র কি নিষ্পত্তি করবো বাছা ; এত সব জানিয়ে-বলিয়ে পুরুষ মানুষ রয়েছেন..."

"আছেন ; তবে কথাটা এতই সাধারণ যে একজন মেয়েমানুষও বলে দিতে পারে, অন্তত: আমাদের কোটালপুরের মেয়েতে পারে, আমি এইটিই জানাবার জন্তে তোমায় একটু কষ্ট দিলাম, জেঠাইমা ; গ্রামটার মুখ্যুদের আড্ডা বলে একটা বদনাম আছে কিনা।" ন্যায়ালংকারের পানে একটা কটাক্ষ হানিল ; মুখের শঙ্কাকুল ভাব দেখিয়া বোঝা গেল—তিনি অর্ধেক কাবু হইয়া আসিয়াছেন।

রামলোচন বুঝিল এবার তাহার পালা, আর ঠেকায় কাহার সাধ্য। একটা চাড়া দিয়া সিধা হইয়া বসিয়া বলিল, "খুব একটা চলতি মেয়েলী কথা নিয়ে আরম্ভ করছি, আমাদের মুখ্যু গ্রাম, সবাই বুঝতে পারা চাইতো ?... জেঠাইমা, তোমরা দুটো মেয়েলী কথা ব্যবহার করো—একটা 'ছিরি', আর একটা 'বি-ছিরি'।—বললে, 'আহা, ন্যায়ালংকার মশাইয়ের বেশ ছিরি আছে বাপু ; কিন্তু, এই টেকো রেমো পণ্ডিতটা কি বিচ্ছিরি রে।'—তা' এখানে ছিরি বলতেই বা তুমি কি সাব্যস্ত করতে চাইলে, আর বিচ্ছিরি বলতেই বা কি সাব্যস্ত করতে চাইলে ?"

ন্যায়ালংকার সহজ ভাব বজায় রাখিবার চেষ্টায় নিজের করতলের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি বলিলেন, "বালাই, অমন ছিরি তোমার, সভা-আলো-করা চেহারা ; তুমি বিচ্ছিরি হতে যাবে কেন, বাছ!..."

"হ্যাঁ, মায়ের চোখে সব ছেলেই সভা-আলো-করা! যাক, আমি কদর্য।... তাহ'লে 'ছিরি' কথাটার আগে 'বি' এই উপসর্গ লাগালে 'ছিরি'র অভাব এই অর্থ হ'ল তো জেঠাইমা? আমাদের পাণিনিও বলেন 'বিঃ অভাবাৎ'—কিনা 'বি' অভাব সূচিত করে..."

"কি জালা! তা' তো করবেই ; হেরকান্তটা কষে আসছে।" 'বি

কথাটা কি ভাল গা ? সৎমাকে বলে 'বিমাতা'—ভিন্ দেশে গিয়ে লোকে কষ্ট পায়,—বলে 'বিভুঁই'।

"হয়েছে, হয়েছে ; কোন টোলের দিগ্‌গজও এরকম করে, চোখে আঙুল দিয়ে বোঝাতে পারবে না। এখন আসল কথায় আসা যাক্,—ভক্তি তো হ'ল ভক্তি ; বি-ভক্তি তা হ'লে কি হ'ল জেঠাইমা ? শুনছি আজকাল নবদ্বীপে মন্ত্রের মধ্যে বিভক্তি এনে ফেলছেন সব—বোধ হয় বাপ-ঠাকুরদার আমলের পুরণো জিনিস বলে অশ্রদ্ধা হয়ে আসছে..."

"ছি ছি, বিয়ে দিতে বসে অলুক্ষুণে কথাগুলো মুখে এনো না, রায়লোচন তোমাদের হ'ল কি ? কোথায় ভক্তি করে মন্ত্র পড়াবে, না..."

রায়লোচন হাত দুইটা চিৎ করিয়া বিমূঢ় ন্যায়ালংকারের দিকে দেখাইয়া বলিল, "ওই ওঁকে বলো জেঠাইমা ; আমি মুখ্যু, আমি অর্বাচীন, আমার তো ভক্তিই সম্বল ; সেইটুকু বজায় রেখে যেমন মন্ত্র পড়াতে হয় পড়িয়ে যাচ্ছিলাম; হ্যাঁ, স্বীকার করি তা'তে একটু বিলম্ব হয়ে যাচ্ছিল, উনি ক্রমাগত 'বিভক্তি-বিভক্তি-বিভক্তি—অত ভক্তিটক্তি আমাদের নবদ্বীপের অলংকার বর বোঝে না, ধারণাই করতে পারে না'...আমি বলি—এ কিরে বাপ !... এই এতগুলো লোক শুনছে, আমি কিছু বানিয়ে বলছি না। আর কেউ বুঝুক না বুঝুক, প্রসন্ন কবিরাজ তো বুঝেছে ?"

না বুঝিয়া উপায়ই ছিল না,—প্রসন্ন কবিরাজ বিজ্ঞের মতো মাথা দুলাইতে লাগিল ; বরং, নেহাৎ সে অন্ধ বুঝে নাই, তাঁহার প্রমাণস্বরূপ একটু যুক্তিরও অবতারণা করিল, "দুজনার মধ্যে সম্প্রদান, তা'তে দ্বিতীয় না হয়ে চতুর্থী হয় কোথা থেকে ন্যায়ালংকার মশাই ?...ঐ তো নয় !..."

রায়লোচন ন্যায়ালংকারের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া একবার সকলের দিকে চোখ বুলাইয়া প্রশ্ন করিল, "নিন্, এইবার বুঝলেন তো, সে বিদ্যের ধাঁধা, না শুধু লম্বাইই ধাঁধা। আগে দেখলাম একটু রাশ চিলে দিয়ে...বলে, আমার সিন্দুকের উইয়ের পেটে যা বিদ্যে আছে...হুঁঃ!"

সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়ালংকারের পানে একটি বক্র দৃষ্টি হানিয়া বলিল, "নিন্ মশাই, বরকে বিভক্তি-অভক্তি যা পড়াবেন পড়ান, এদিকে আমাদের ভক্তিই পদ্ধতি—নবদ্বীপের নবপদ্ধতি চালাতে দিচ্ছে কেমন জানি। শুনলেন তো

সমর্থনের একটা জয়রোল উঠিল। ন্যায়ালংকার মহাশয় হাতে মন্ত্রের

টিপ লইয়া নির্বাক বিস্ময়ে কিংভূতকিমাকার হইয়া বসিয়া রহিলেন। চারি দিকের কলরোলের মধ্যে এক তিনিই চাপা সুর শুনিতে পাইলেন, "হ্যাঃ, এই হাটে বিভক্তি দেখাতে এসেছেন—দ্বিতীয়া নয় চতুর্থী!—তোর চতুর্থীর নিকুচি করেছে!..."

[বঙ্গশ্রী, মাঘ ১৩৪০]

দাদুর সমস্যা

প্রজাপতি-সংহিতার আধুনিকতম সংস্করণে লেখা হইয়াছে,—প্রয়োজন বুঝিলে মেয়ে অসাবধান হইয়া হাতের রুমালটি ফেলিয়া দিবে; ছেলে সেটি সযত্নে তুলিয়া ধরিয়া দাসত্ব-গৌরবের অভিনয় করিয়া বলিবে—"আপনার রুমালটা..."

মেয়ে সেটি গ্রহণ করিয়া বলিবে—"থ্যাংক্স্", অর্থাৎ ধন্যবাদ। ছেলে প্রবল কুণ্ঠার সহিত বলিবে, "নীড্ নট্ মেনশন্, অর্থাৎ উল্লেখ করে লজ্জা দেবেন না।"

ইহার পর দু-জনে না-চাহিবার চেষ্টা করিয়া পরে একবার সলজ্জভাবে চাহিয়া ফেলিবে।

অতঃপর সংহিতাকার নিজেই কর্মক্ষেত্রে নামিয়া পড়িয়া স্থান-কাল-পাত্র হিসাবে ব্যবস্থা করিবেন।

বিমলেন্দু কলিকাতার একটি কলেজে তৃতীয় বাৎসরিক শ্রেণীর ছাত্র। একদিন কলেজের প্রাঙ্গণে ঐ শ্রেণীর নবাগতা ছাত্রী অর্চনা রায়ের রুমালটি কুড়াইয়া দিবার তাহার একটু সুযোগ ঘটিয়া গেল। বিমলেন্দু দেখিল, অমন ছিরি বুঝিল দুর্যোগের মতো সুযোগও কখনও একলা আসে না। "কেন, বাট্!..." বলিল এবং এক সপ্তাহের মধ্যে আরও তিনটি অনুরূপ সুযোগ আসি কদর্প। তাহার পুরুষকারের বলে ঘটিয়া গেল। চতুর্থ দিবসে শাস্ত্রনির্দিষ্ট ছিরি'র অভাব পরও সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে কিছু অতিরিক্ত আলাপও অত্যাবশ্যক'—

বিমল প্রশ্ন করিল, "আপনার কোন্ ইয়ার?"

আলা জিনিস লইয়া এ-রকম অত সাজিতে গেলে মনের আসছে। কবি'

স্পষ্ট হইয়া উঠে। অর্চনা সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিতে পারিল না, একটু লজ্জিত হইয়া মুখটি ঘুরাইয়া লইল। তখন বিমলেন্দুও সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "ও, ঠিক তো! আপনাকে আমাদের থার্ড ইয়ারেই কোন কোন ক্লাসে যেন দু-একবার দেখেছি বলে মনে হচ্ছে..."

কথাটাকে একটু টানিয়া সত্য রূপ দেওয়া যায়। যতক্ষণ ক্লাস চলে প্রতি মিনিটে বিমলেন্দু অর্চনাকে দু-একবার দেখে। ব্যাপারটা অর্চনার এমন কিছু অবিদিতও নয়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই মিথ্যার প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা, সামান্য অবিশ্বাসের ভাবও দেখাইল না।

বিমল দু'টা সিঁড়ি উঠিয়া আবার প্রশ্ন করিল, "আপনার রোল্ নাম্বার?"
অর্চনা উত্তর করিল, "সাতাশী"। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নও করিল, "আপনার?"

বিমলেন্দুর দুই আঙুলে-ধরা নোটবুকটা সিঁড়িতে পড়িয়া গেল, সেটা কুড়াইয়া লইয়া বলিল, "অষ্টআশী।"

অর্চনা শুধু একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "ও!"—তাহার এ অসামান্য কথাটি যেন মোটেই জানা ছিল না।

মিথ্যাকে আমরা প্রবন্ধ-বক্তৃতাতে যতই লাঞ্ছনা করি না কেন, এ-সব ক্ষেত্রে কার্য অগ্রসর করিয়া দিতে অমন বস্তু আর নাই। দিব্য একটি নির্বিঘ্ন প্রচ্ছন্নতার আড়াল দিয়া যেন দর্পণে উভয়ে উভয়ের মনটি দেখিয়া লইল।

তাহার পরদিন বিমলেন্দুর ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের জন্য আবার দু-জনের হঠাৎ সিঁড়ির গোড়ায় দেখা হইয়া গেল। বিমল নমস্কার করিয়া বলিল, "আজ দেখছি যে আপনারও বড্ড লেট্ হয়ে গেল, আমি ভাবলাম বুঝি আমার একারই দেরি হ'ল!"

অর্চনা তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে হাতঘড়িটার দিকে চাহিয়া বলিল, "হ্যাঁ, দেখুন না; একটা মাড়োয়ারী ম্যারেজ প্রোসেসনের জন্যে বাঁধ, না শুধু ...কা পড়ে গেল। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে নিরুপায়ভাবে দাঁড়িয়ে আবার সিন্দু... কি বিড়ম্বনা..."

সঙ্গে ...লিল, "সে আর বলতে?...আমারও খানিকটা দেরি হয়ে গেল। ...লিন্ মশাই, ...ট দেরি, প্রোফেসার গুপ্ত নিশ্চয় প্রেজেন্ট্ করবেন না; যাবো ভাবিই পর্যন্ত... এমন সময় আপনাকে দেখে কতকটা ভরসা হ'ল।"

...শুনলেন তো ...ঠিতে উঠিতেই একটু সলজ্জ হাসির সহিত জিজ্ঞাসুনেত্রে ...

সমর্থনের ...মলেন্দু একটু হাসিয়া বলিল, "মানে, তিনি লেডি-স্টুডেন্টের

অপমান করতে পারবেন না তো?...তার পরই আমার রোল-নাম্বার—প্রেজেণ্ট না করে উপায় থাকবে না।"

অর্চনা এই ফন্দির জন্ত মুখ ঘুরাইয়া হাসিতে গিয়া একটু দুলিয়া উঠিল। আরও দুইটা সিঁড়ি উঠিয়া সে-বাঁকা মুখটা গম্ভীর করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। বিমল মুখ তুলিয়া চাহিতে বলিল, "তাঁর দয়ার সুবিধে নেওয়া হবে, তার চেয়ে একটা পার্সেণ্টেজ্ হারানো ভালো। এ-পিরিয়ডটা কমন্-রুমে গিয়ে বসতে যাচ্ছি। আপনি তো ক্লাসে গিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখবেন,—আপনাদের স্কলারদের তো অ্যাটেণ্ডেন্স্ নিয়ে কড়াকড়ি অনেক..."

বিমলেন্দু সে কথার উত্তর না দিয়া, অর্চনার চেয়েও মুখটা গম্ভীর করিয়া অতি-বড় ধার্মিকের মতো বলিল, "ঠিক বলেছেন,—তাঁর প্রিন্সিপ্‌ল্‌টা আমাদের ভাঙা অনুচিত হবে না। না, আমিও তা'হলে কমন্-রুমেই গিয়ে বসি।"

এইরূপ প্রোফেসার গুপ্তের প্রতি অন্যায় করিয়া ফেলিবার ভয়ে দুইজনে নামিয়া কমন্-রুমে গিয়া বসিল।

অবশ্য কমন্-রুমে বিশেষ কিছু কথাবার্তা হইল না। কারণ উভয়েই প্রোফেসার গুপ্ত সেই পিরিয়ডে যাহা পড়াইতেছেন সেইটি খুলিয়া বসিল। বিমলেন্দু দশ-বারো বার খুব সন্তর্পণে দৃষ্টি বাঁকাইয়া দেখিল, অর্চনা প্রচণ্ড মনোযোগের সহিত পাঠে নিরত। অর্চনাও পাঁচ ছয়বার চকিতের জন্ত বই হইতে চক্ষু তুলিয়া দেখিল, বিমলেন্দু বইয়ের সঙ্গে প্রায় মিশিয়া গিয়াছে, বাহ্য-জ্ঞানশূন্ত বলিলেও চলে। কেউ কাহারও ব্যাঘাত করিল না। সত্যই তো, তাহারা প্রোফেসার গুপ্ত-সাহেবের প্রিন্সিপ্‌ল্ ভাঙিবে না বলিয়া না-হয় ক্লাসে যায় নাই, তাহা বলিয়া পড়ায় ফাঁকি দেওয়া তো তাদের উদ্দেশ্য নয়।

শুধু পিরিয়ড্ শেষ হইলে উঠিয়া দাঁড়াইতে বিমলের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। যেন কত যুগের জন্তই না বিদায় লইতেছে এইভাবে একটি নমস্কার করিয়া ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা, তা হ'লে আসি, মিস্ রায়। আপনার তো ছুটি এ-পিরিয়ডে?"

অর্চনা বলিল, "হ্যাঁ, এর পরের পিরিয়ডে আমার হিস্ট্রি।"

টেবিলের উপর বই-খাতার তাড়াটা ঠুকিতে ঠুকিতে বিমল বলিল, "আমার এ-পিরিয়ডে ফিলজফি।...ভাবছি ছেড়ে দোব, ছেড়ে দিয়ে হিস্ট্রিই নোব।"

হঠাৎ ফিলসফির উপর এত বিরাগ কেন, আর হিস্ট্রির উপরই বা এত টান কিসের সে সম্বন্ধে কিছু বলিল না।

অর্চনাও অবশ্য জিজ্ঞাসা করিল না।

সপ্তাহখানেক পরের কথা।

বিমলেন্দু ও অর্চনা একটি বেঞ্চের দুই প্রান্তে বসিয়া আছে; মাঝখানে দুইজনের বই।

কলেজের বেঞ্চ নয়।...বেঞ্চের সাম্‌নেই একটু দূরে একটি কৃত্রিম হ্রদের কিনারা গোল হইয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। মাথার উপরে একটি হলদে ফুলের ঝাঝারি-গোছের গাছ, তাহার ঘন ছায়াটা জলের গায়ে তুলি বুলাইতেছে। কিনারা হইতে হাত-দুয়েক পরেই গুটিকতক রাঙা কহ্লারের গুচ্ছ, দুইটি ফুটিয়া পরস্পরের পাপড়িতে জড়াজড়ি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ওপারের বেঞ্চে একটা পশ্চিমা, বোধ হয় মালী, দি[illegible] লাগিয়া এইমাত্র উঠিয়া বসিল।

আজ কলেজে কি একটা কারণে ছুটি হইয়া গেছে, ইহারা দুইজনে বাড়ি ফেরে নাই এখনও।

বিমলেন্দু বলিল, "তোমার মধ্যে আমার যা সবচেয়ে ভালো লাগে অর্চনা, তা তোমার এই বিদ্রোহ। তোমায় বুঝতে দিই নি—মেয়ে-কলেজ ছেড়ে তুমি যেদিন আমাদের কলেজের ফটক পেরিয়েছ সেইদিন আমি তোমায় আমার মনের মধ্যেও শ্রদ্ধায় অভ্যর্থনা করে নিয়েছি।"

অন্য রকম কথা হইতেছিল।—প্রোফেসারদের পড়ানো—শেলী, কীট্‌স্, হুইট্‌ম্যান, রবীন্দ্রনাথ—আই-এর চেয়ে বি-এ-তে বিমলেন্দুর আরও ভালো করিবার সম্ভাবনা···এর মধ্যে একটু বিরতি দিয়া হঠাৎ বীররসের অবতারণা। অর্চনা একটু যেন লজ্জিত হইয়া পড়িল।

বিমলেন্দুর ভাবের ঘোর লাগিয়াছে, একটু থামিয়া বলিল, "আসল কথা হচ্ছে, তোমার এ-অ্যাটিচিউড্‌টুকু আমার জীবন-স্বপ্নের সঙ্গে মিলে গেছে।—যা কিছু পুরোণো যুগজীর্ণ—ব্যক্তিগত রুচিতে, সামাজিক আচারে বা ধর্মের ছদ্মনামে—সে-সমস্তর বিরুদ্ধেই আমার অভিযান, আমি সে-সমস্তকেই ঘা দেব। এ-অভিযানের পথে যারা আমার সঙ্গী, আমার কম্‌রেড, তাদের ওপর যে আমার কত শ্রদ্ধা, তা প্রকাশ করে বলবার ভাষা নেই, অর্চনা।"

শেষ পর্যন্ত অর্চনাকেও কথাগুলা স্পর্শ না করিয়া পারিল না ; মেয়ে হইলেও, এই যুগের মেয়ে তো—এই যুগের অগ্রণী মেয়ে ? বলিল, "আমি বিদ্রোহের কথা বলতে পারি না বিমলবাবু, তবে মেয়েদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থাতে আমার মন সায় দিলে না ; কলেজের মধ্যেও যেন মোগল-হারেমের বদ্ধ হাওয়ার গুমটে আমি হাঁপিয়ে উঠলাম ; আমার জীবন-দেবতা আমায় এই পথ দেখিয়ে দিলেন, আমি পা বাড়াতে দ্বিধা করলাম না। আমি বিদ্রোহী কিনা জানি না, তবে আমি যে দ্বিধা-সংকোচ ঠেলে আপনাদের সঙ্গে এসে দাঁড়ালাম, এটা করলাম আমি চিরদিনের বঞ্চিত, সমগ্র নারীর অভিযোগ হিসেবেই…"

বলিতে বলিতে মুখটা তাহার দীপ্ত হইয়া উঠিল।

এ-ভাবটা কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হইল না—হইবার কি কথা ? ফাল্গুনের হাওয়ার মধ্যে মাঝে মাঝে যেমন একটা চৈতীর হল্কা বহিয়া যায়—এও সেই রকম !

একটু পরে আবার অর্চনার দৃষ্টি নরম হইয়া আসিল। একটু যেন অভিমানের সুরে অনুযোগ করিল, "আপনারা আমাদের কতই না বঞ্চিত করেছেন দেখুন তো !—এই চমৎকার নীল আকাশ, মুক্ত হাওয়া, জলস্থলের এই কতরকম সৌন্দর্য, চারিদিকের কত বিচিত্র জীবন…পুরুষের বিরুদ্ধে আমাদের নালিশ…"

বিমলেন্দু হঠাৎ বাধা দিয়া প্রতি-অনুযোগের স্বরে বলিল, "আমি বঞ্চিত করেছি, অর্চনা ?"

অর্চনা একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল ; বলিল, "না, আপনার কথা বলছি ; আপনি তো আমায় এর সন্ধান দিয়ে নিয়েই এলেন ; আমি বলছি সাধারণ স্ত্রীজাতি আর পুরুষের কথা। ভাবুন তো আমাদের মেয়েরা কতটা বঞ্চিত থাকে !"

বিমল বলিল, "তাঁরা ইচ্ছে করেও থাকেন অনেকটা।"

"কেন ?"

"ধরো তুমি তো রোজ একবার করে আসতে পারো ; কই, আসবে ?"

অর্চনা একটু হাসিয়া বলিল, "কলেজ-কামাই হবে যে !"

বিমল বলিল, "আমি পারি,—যদি এ-রকম পরিপূর্ণ সৌন্দর্য পাই, অর্চনা। [illegible] কলেজে বসেই আমার মনে হয় আমি এখান থেকে কামাই করছি।"

'পরিপূর্ণ' কথাটার উপর জোর দিল এবং পরে বলিল, "তোমরা বাঁধন ভালোবাসো, অর্চনা; হাজার সৌন্দর্যের জন্যেও বাঁধন কাটতে নারাজ।'"

আর একটু পরে সামনের পুষ্পস্তবকের উপর নজর রাখিয়া বলিল, "বোধ হয় তোমরা নিজের মধ্যেই পরিপূর্ণ বলে সন্তুষ্ট এবং তৃপ্ত থাকো।"

অর্চনা মুখ ঘুরাইয়া লইল, সেই ভাবেই প্রশ্ন করিল, "সবাই কি?"

বিমল একটু জেদের সহিত বলিল, "কেন, কোথায় তোমার অপূর্ণতা? বলো—কিসে?"

অর্চনা সন্তুষ্ট আর তৃপ্ত থাকার সম্বন্ধে প্রশ্নটা করিয়াছিল, নিজের প্রশ্নটা বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় রাঙিয়া উঠিল। অনেক চেষ্টা করিয়া, বিমলের দিকে একবার মাত্র চাহিয়া বলিতে পারিল, "উঠবেন না?—আমার গাড়ি বোধ কলেজে এসে গেছে এতক্ষণ।"

বিমলেন্দু ডাকিল, "রুচি!"

নূতন কাহাকেও ডাকিল না, সে আজকাল অর্চনাকে এইভাবে ডাকিতেছে; এ-শ্রেণীর লোককে যদি অমৃত দেওয়া হয় তো সেটাকেও ক্ষীর করিয়া লইয়া ছাড়িবে।

সেই জলের ধারের জায়গাটি। শেষের দিকের দুইটি পিরিয়ডে ছুটি ছিল, সব শেষের পিরিয়ডে প্রোফেসার বোস হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন।

আজ ছয়দিন পরে; কিন্তু এই ছয় দিনে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। অর্চনা হইয়াছে রুচি। রুচি প্রবল হইলে বিমলেন্দু কখনও 'অরুচি' বলিয়া ডাকিয়া ফেলিতেছে। বিমল দর্শনশাস্ত্র ছাড়িয়া ইতিহাস লইয়াছে, আজ এখানে আসার ইতিহাসটুকুও এই ব্যাপারটির সহিত জড়িত।, অর্চনার নিকট হইতে পুরাতন নোটগুলি টুকিয়া লইবে, তাই দুইজনে এই নিরিবিলি-টুকু আশ্রয় করিয়াছে।

অর্চনা নোটের পাতা উলটানোর মাঝে থামিয়া উত্তর করিল, "কি?

বিমলেন্দু প্রত্যুত্তর কিছু দিল না। জড়াজড়ি করিয়া যে রাঙা কচুরিপানার দুইটি ছিল তাহারা আর নাই; সেই শূন্যতাটুকুর দিকে চাহিয়া রহিল।

অর্চনা নোটের পাতা আরও খানিকটা এদিক ওদিক উলটাইল। তাহার

পর মৌনতার অস্বস্তিটা কাটাইবার জন্যই বোধ হয় প্রশ্ন করিল, "গ্রীষ্মের ছুটির আগে যে সোশ্যাল পার্টি হবে তা'তে আপনি কোনও পার্ট নিলেন না কেন বিমলবাবু ?...অত করে বললে সবাই..."

বিমল ধীরে ধীরে চক্ষু তুলিয়া প্রশ্ন করিল, "তুমিও একথা জিজ্ঞেস করে তবে জানবে, রুচি ?"

অর্চনা একটু চিন্তা করিল,—আবার নোটের পাতা উলটাইতে উলটাইতেই তাহার পর একটা পাতা আঙুল দিয়া মুড়িয়া ধরিয়া বলিল, "বুঝলাম না।"

"বিচ্ছেদটা কি একটা উৎসব, রুচি ?"

অর্চনা প্রথমটা বুঝিতে পারিল না, তাহার পর কথাটার অর্থ তাহার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া তাহার মনটিকে ভারাক্রান্ত করিয়া দিল, সে মুখ ফিরাইয়া একদিকে চাহিয়া রহিল। সত্যই তো, এই গ্রীষ্মাবকাশের দীর্ঘ—তিনটা মাস আর যাহার কাছেই উৎসব সূচিত করুক—অন্ততঃ এ-কলেজের দুইটি প্রাণীর কাছে যে করে না, তাহাতে কি কোন সন্দেহ আছে ? ...ওদের সবার সামনে প্রিয়জনের সঙ্গে মিলন—সেই মিলনকেই ওরা আমন্ত্রণ করিতেছে এই উৎসবের দ্বারা। ওরা যে নাম দিয়াছে 'বিদায় অভিনন্দন',—ওটা ভুল,—ওদের বিদায়ে দুঃখ নাই বলিয়াই এটা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু যে দুজনের পক্ষে এ বিদায় সত্যই বিদায়—এই অবকাশ যাহাদের মধ্যে শতাবধি দিনব্যাপী শতযুগের দাহন আনিবে তাহাদের কি উৎসবের অবসর আছে ?...অর্চনার আশ্চর্য বোধ হইল যে, এদিকটা ভাবে নাই কেন এবং যে এই ভাবনায়ই মুহ্যমান, তাহার সামনে একটু অপ্রতিভ হইল।

সেদিন দু-জনে বাহিরে-বাহিরে কথা আর বেশি কিছু হইল না, তবে দু-জনের মনের মধ্যে যে সমস্ত কথা নিঃশব্দে উঠিয়া মিলাইয়া যাইতে লাগিল সে-সব একই প্রকৃতির।

কলেজ বন্ধ হওয়ার সময় হইয়া গেল। জলের ওধারটায় সবুজ ঘাসের উপর দু-একটি করিয়া সাহেবদের ছেলেমেয়ে আসিয়া খেলা করিতে লাগিল, তাহাদের আয়া আর বয়রা মোড়ার উপর বসিয়া গল্প করিতেছে। দু-জনে উঠিল। কথার অভাব হইয়া পড়িয়াছে আজ, অথচ উঠিবার সময় যে দীর্ঘ-কালটুকু পড়িল সেটাকে ঢাকিতে কিছু বলিতেই হয় যেন।

অর্চনা সামনের একটি কহ্লারের দিকে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা, কলেজ যখন খুলবে তখনও এসব ফুটতে থাকবে ?"

বিমল বলিল. "কি জানি, রুচি ? তিন মাস একটা যুগ যে।"

সে-রাত্রে অর্চনার নিদ্রা হইল না। কিন্তু সে তো আর কালিদাসের যুগের মেয়ে নয় যে, বিরহের সূচনাতে শৃঙ্গার পরিবর্তন করিয়া বীণার তার বাঁধিতে বসিয়া যাইবে।

সকালে উঠিয়া ছোট ভাই প্রবীরকে ডাকিয়া বলিল, "বীরু, তোমার বইগুলো নিয়ে এসো তো ; যে-রকম অমনোযোগী হয়ে উঠছো দিন দিন··"

প্রবীর ছেলেটি ভালো, ইংরেজী পড়া বেশ ভালোই দিল। ইতিহাস আনিতে বলা হইল ; বেশ সন্তোষজনক উত্তরই দিল। অর্চনা তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "মুখস্থ করবার গুলো তো একরকম চালিয়ে দিলে, অঙ্ক নিয়ে এসো তো দেখি।"

সহজ অঙ্কে আটকাইবে না বুঝিয়া, বেশ বাছা বাছা গোটাকতক অঙ্ক দিল। তাহাতে বেশ মনের মতো ফল পাওয়া গেল। ভিতরে ভিতরে ভাইয়ের উপর খুশি হইয়া অর্চনা প্রকাশ্যে রাগতভাবে বলিল, "আমি জানি কিনা,—দেখছি এদিকে বেশ গা ঢেলে দিয়েছ।"

অভিভাবক ঠাকুরদাদা। নামজাদা উকিল ছিলেন। লোকে বলে বড় পাকা মাথা। ছিল বোধ হয় এক সময়, এখন সেটি সম্পূর্ণরূপে নাতনীর হাতে সমর্পণ করিয়া নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপন করিতেছেন। গঙ্গাস্নান, কালীঘাট ও ভাইটামিন আর পরমায়ুতত্ত্বের আলোচনায় অবসরটা বিভক্ত।

অর্চনা বলিল, "দাদু, বীরুর অবস্থা দেখেছ ?—অঙ্কেতে ও তাহা ফেল করবে ; এই সামার-ভেকেশনের পরেই ওদের পরীক্ষা, মাস তিনেকও নেই। নিজের মোটেই সময় নেই যে দেখি ; কি যে হবে !..."—বড়ই চিন্তান্বিত ভাবটা।

বীরুর ডাক পড়িল। আসিলে ঠাকুরদাদা বলিলেন, "অঙ্কটা ঠিক তৈরী নেই শুনছি। তুমি রোজ রাত্তিরে আমার কাছে এসে বোসো তো এরিথ্-মেটিক্‌টা নিয়ে।"

অর্চনা একটু চুপ করিল, তাহার পর বলিল, "হ্যাঁ, তুমি আবার ঐ

করো। একে ভালো ঘুম হয় না রাত্তিরে; তার ওপর ওর সঙ্গে বকে বকে...আমি বলছিলাম একটা নাহয় টিউটার রেখে দাও না।"

টিউটার সম্বন্ধে ঠাকুরদাদার চিরকালই আপত্তি; বলেন, "ও তে বাজারের নোটের সামিল—শুধু হাত-পা আছে, চলে বেড়ায় এই য তফাৎ।"

কাল পর্যন্ত অর্চনারও এই মত ছিল। গত রাত্রি হইতে বদলাইয়াছে বলিল, "বরাবর না হয়, অন্ততঃ তিন মাসের জন্যে একটু সামলে দিক্, তার পর..."

ঠাকুরদাদা চিন্তিতভাবে বলিলেন, "টিউটার?...তা তুমি যখন বলছো... নিজে মেক আপ করে নিতে পারবে না বীরু তুমি? সেই হ'ত ভালো— আত্মচেষ্টা..."

বীরু উৎসাহভরে উত্তর দেওয়ার আগেই অর্চনা বলিল, "না, পারবে না"—এমন জোরের সহিত বলিল যে বীরু চুপ করিয়া রহিল।

"তা হ'লে দেখ...তোমাদের মাস্টার কেউ রাজি হবেন বীরু?—তিন মাসের জন্যে?—জিজ্ঞেস্ করে দেখবে আজকে?"

বীরু উত্তর দিবার আগেই অর্চনা আবার জোর দিয়া বলিল, "না না, হবে না রাজি; স্কুলের মাস্টারদের বাঁধা টিউশান থাকে।"

বীরু আবার চুপ করিয়া গেল। ঠাকুরদাদা বলিলেন, "হয়েছে!— তোমাদের কলেজের কোন ছেলে পাওয়া যাবে না? জিজ্ঞেস করে দেখো না, সামনে তিন মাসের ছুটি পড়ে রয়েছে।"

"তুমি কথাগুলো একটু ভেবে বলো তো, দাদু! আমি জিগ্যেস করতে যাবো—আমার সেখানে কার সঙ্গে জানাশোনা?"

"তবে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দেবে? দাঁড়াও, আমি না-হয় দেখি দু'চার জনকে জিগ্যেস করে।"

ঠাকুরদাদার হাতে গেলেই তো বেহাত হইল। কলেজে এতটা অপরিচয়ের ভাবটা দেখান ভালো হয় নাই। একটু চিন্তা করিয়া অর্চনা বলিল, "রোসো দাদু, এক কাজ করা যাবে, একটা বিজ্ঞাপনের মতো লিখে পিওনকে দিয়ে আমাদের কলেজের নোটিশ-বোর্ডে টাঙিয়ে দেব'খন। যারা চায় তোমার সঙ্গে দেখা করুক, তুমি বেছে নিও।"

"তুমিও থাকবে তো!"

"না, আমার দ্বারা হবে না।"

"থাকলে ভালো হ'ত। লোক বাছা একটু শক্ত কিনা।"

লোক বাছা একটুও শক্ত হইল না, কারণ অত বড় কলেজের মধ্য হইতে একটিমাত্র ছেলে আসিয়া ঠাকুরদাদার সহিত দেখা করিল। তিনি ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়া কাগজ পড়িতেছিলেন। ছেলেটি বারান্দায় উঠিয়া একটা নমস্কার করিয়া বলিল, "এই কি উমেশবাবুর বাড়ি? তাঁর সঙ্গে—মানে, তিনি..."

"...আমিই উমেশবাবু, কি দরকার আপনার?"

"আমাদের কলেজের নোটিস্-বোর্ডে একটা এ্যাড্‌ভার্টাইজমেন্ট্..."

ঠাকুরদাদা উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, "ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক, আমার চাই একটি টিউটার। কোন্ ইয়ারে পড়েন আপনি?"

ছেলেটি একটি ঢোক গিলিয়া বলিল, "থার্ড ইয়ারে।"

বেশ ছেলেটি।—দীর্ঘ, সবল চেহারা; ছিমছাম পরিচ্ছদ; মুখে বেশ একটি বুদ্ধির দ্যুতি। একটা আবেদন লইয়া আসিয়াছে; কিন্তু কোথাও একটু হীনতার ভাব নাই, বরং একটু সলজ্জ বলিতে পারা যায়।

বৃদ্ধের ভালো লাগিল, বলিলেন, "বসুন, বসুন ঐ চেয়ারটায়। থার্ড্ ইয়ারে পড়েন? তাহ'লে তো আমাদের অর্চনার সঙ্গে আলাপ আছে নিশ্চয়।"

ছেলেটি অজ্ঞের মতো একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করিল মাত্র, যেন মনে করিবার চেষ্টা করিতেছে।

বৃদ্ধের পাকা ভ্রূও একটু যেন কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, "জেনেন না? ক'টি ফিমেল স্টুডেন্ট থার্ড ইয়ারে?"

ছেলেটি ভ্রূ দুইটি একটু তুলিয়া বলিল, "ও, মিস্ রায়ের কথা বলছেন? তিনি কি এই বাড়িতেই..."

বৃদ্ধের ভ্রূর কুঞ্চন এবার মিলাইয়া গেল, "আমার নাতনী কিনা। এই তো ছিল একটু আগে।...অর্চু!"

প্রবীর আসিয়া বলিল, "দিদি এইমাত্র গাড়িতে করে বেরিয়ে গেল।"

"কোথায় গেল হঠাৎ?...যাক্, আলাপ হবেই। হ্যাঁ, কলেজে আর আলাপ হবে কি করে?—অত সময় তো পাওয়া যায় না।...এই ছেলেটি

আপনার ছাত্র। তোমার মাস্টারমশাই বীরু, প্রণাম করো।…কি না আপনার!"

"বিমলেন্দু দত্ত।"

"থার্ড ইয়ার—বি-এস্‌সি?"

"আজ্ঞে না, আর্ট্‌স্‌।"

"কি কি সাব্‌জেক্ট নিয়েছেন?…আর সাবজেক্টের জন্যে তো ভারি বাধা—ছাত্র আপনার মোটে ফিফ্‌থ্‌ ক্লাসে তো পড়ে।"

"ম্যাথ্‌মেটিক্‌স্‌ আর হিস্টি্র।"

"অর্চুরও তো ঐ কম্বিনেশান্‌!"

বিমলেন্দু চোখ তুলিয়া সামনের গাছটার ডগায় অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কি একটা দেখিতে লাগিল।

দেখিবার এমনই চমৎকার ভঙ্গি যে এবার ঠাকুরদার ভ্রূ আর একটুও কুঞ্চিত হইতে পারিল না, এমনই মনে মনে হাসিয়া নিজের মনেই বলিলেন, "দেখ, এ-যুগ আর সে যুগ!—শ্যামবাজারে মেয়ে-স্কুল খুললো—মাইল খানেক পথ ঘুরে কলেজে গেছি—একটু পাশ দিয়ে যাবার লোভে।…আর এরা এক ক্লাসে পড়ে—এক কম্বিনেশান্‌—নাম পর্যন্ত জানে না!—ভালোই!"

এ-যুগের এ-বেচারীরা একটু লাজুক বেশি। মেয়েরা যতই বাহির হইয়া আসিতেছে, ইহারা ততই যেন সংকুচিত হইয়া অন্তর্মুখী হইয়া পড়িতেছে। অথচ শরীরের চর্চাও করে সব পূর্বের চেয়ে বেশি; পুরুষালি ভাব আছে, ইঞ্চি ইঞ্চি করিয়া সযত্নে বুকের ছাতি বাড়ায়—চওড়া ছাতি চিতাইয়া দাঁড়ায়। এই ছেলেটি ওদেরই টাইপ। বেশ ভালো লাগিতেছে বিমলেন্দুকে। নূতন পরিচয় হিসাবে কথাবার্তা একটু বেশিই হইল বরং,—টিউশানের পরিধির বাহিরেও গড়াইয়া গেল।

"অনার্স নেওয়া হয়েছে?…অর্চু নিলেনা, মেয়েছেলের অতটা দরকারও নেই।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ম্যাথ্‌মেটিক্‌স্‌।"

"হুঁ, ম্যাথ্‌মেটিক্‌স্‌। আর অনার্স!—হাই এডুকেশানের যা অবস্থা! পড়ে লোকে করবে কি?…আপনার উদ্দেশ্যটা কি? ঠিক করেছেন কিছু?"

"দেখি, কম্পিটিটিভ্‌ এগ্‌জামিনেশান দেওয়ার ইচ্ছে আছে কোন-একটা।"

বিমলেন্দুর আর যাহাই দোষ থাক আত্মঢাকাটা নাই। কথাটা নিজের

কানেই একটু গালভরা শুনাইল বলিয়া জুড়িয়া দিল, "কোন রকম ব্যাকিঙের জোর নেই কিনা যে এমনি চাকরি-বাকরি কোথাও পেতে পারবো..."

বাঃ, বেশ ছেলে, ঠাকুরদাদার উত্তরোত্তর এর সাহচর্যটি বেশি করিয়া ভালো লাগিতেছিল—প্রজাপতি কি অবতীর্ণ হইলেন বৃদ্ধের মধ্যে? একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইতেছিল; কিন্তু একটু কুণ্ঠাও হইতেছিল। অবশেষে একটু ঘুরাইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, স্টুডেন্ট কেরিয়ার ভালো হ'লে ও-দিকেই চেষ্টা করা ভালো।"

মুখের দিকে একটু সপ্রশ্ন নেত্রে চাহিলেন; কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া সোজাসুজিই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার ম্যাট্রিক, আই-এতে কোনও প্লেস্ ছিল?"

বিমল একটু লজ্জিতভাবে বলিল, "আজ্ঞে না, প্লেস্ কোন ছিল না, তবে..."

একটু থামিয়া বলিল, "ম্যাট্রিকে একটা ডিভিশনাল স্কলারশিপ পেয়েছিলাম, আই-এ-তেও পাচ্ছি একটা স্কলারশিপ, তবে ঠিক প্লেস্ থাকা বলা যায় না।"—বলিয়া মাথা একটু নিচু করিল।

"বড় আনন্দ হ'ল শুনে। অল্-ইণ্ডিয়া কম্পিটিশানে যাবেন। ওদিকে আমাদের বাঙালীর ছেলেরা বেশি এগচ্ছে না; ঠিক হচ্ছে না এটা।...বীরু, তোমার মাস্টারমশাইকে চা'টা এনে দাও...অল্-ইণ্ডিয়াতেই দেবেন। কই, আমরা তিন-চার জেনারেশানে যে-জায়গাটা হাসিল করলাম বাঙালী জাতটার জন্যে, আপনারা তা' রাখতে পারছেন কই!"

বিমলেন্দু লজ্জিতভাবে বলিল, "আজ্ঞে, অপবাদটা দেওয়া আপনাদের অসংগত নয়, তবে কারণ তো একটা নয়—জানেনই তো।"

"তা হোক্, তবু আপনাদের মতো ভালো ছেলেদের এ-বিষয়ে জাতির প্রতি একটা কর্তব্য আছে। না, চেষ্টা করতে হবে; আমি আপনার মেজাজটা ওয়াচ্ করতে থাকবো।"

হাসিয়া বলিলেন, "আপনি বোধ হয় ভাবছেন—আমি করতে এলাম মাস্টারি, আমার ওপর এ-আবার কোত্থেকে এক মাস্টার জুটে গেল রে বাবা!...কি জানেন? বসে বসে কাগজে দেশের দুঃখ-দুর্দশার কথা পড়ে বড় দ'মে যেতে হয়। বুড়ো হয়ে আর বেশি ঘোরাঘুরি সভা-সমিতি চলে না যে এ নিয়ে একটু চর্চা করবো; তাই একটা রোগ দাঁড়িয়ে গেছে—ইয়ংম্যান্ কাউকে কাছে পেলেই..."

বীরু চা জলখাবার লইয়া আসিল। অনেক রকম কথা হইল; নান
রকম খবর রাখে ছেলেটি, আর যাহা বলে নিতান্ত ভাসা ভাসা নয়। ওই
সময় ঠাকুরদাদা বলিলেন, "তা হ'লে আপনি পড়াতে আরম্ভ করে f
যত শীগ্‌গির পারেন। ছাত্র আপনার অঙ্কে একটু কাঁচা, ঐদিকটা এ
একটু করে হেল্‌প্‌ করে যাবেন। আমি আবার বেশি কোচিং পছন্দ ক
না। হ্যাঁ, টার্মসের কথা…"



'…চেনো বোধ হয় এঁকে ?'

এমন সময় বাড়ির গাড়িটা ফটক পার হইয়া গাড়িবারান্দায় আসি
দাঁড়াইল। ভিতরে অর্চনা।

সে ভাবিয়াছিল এতক্ষণ বিমলেন্দু নিশ্চয় চলিয়া গিয়া থাকিবে। তাঁহাকে

ঠাকুরদাদার সহিত বারান্দায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সংকোচে—হু' অক্ষের নিকটেই হুংকোচে—গাড়ি হইতে নামিতে পা উঠিতেছিল না। কিন্তু তখন তাহার আর ফিরিবার পথ নাই।

ঠাকুরদাদা উৎফুল্লভাবে বলিয়া উঠিলেন, "এই যে অর্চু এসেছে।...নেমে এসো। ইনিই বীরুর টিউশনের জন্তে এসেছেন।...কোথায় ঘুরছিলে অর্চু তুমি?—এত সকালেও ঘেমে উঠেছ, মুখখানা রাঙা হয়ে গেছে।...চেনো বোধ হয় এঁকে? তোমাদের ক্লাসেই পড়েন...কি যে বেশ নামটি বললেন আপনার?"

নিজের নাম বলা যে অবস্থাবিশেষে এত শক্ত বিমলের তাহা জানা ছিল না। গলার কাছে এলোমেলো অক্ষরগুলা কোনরকমে গুছাইয়া বলিল, "বিম্—বিমলেন্—দু।"

হাতের রুমালটা কপালের ঘামের উপর চাপিয়া অর্চনা অজ্ঞের মতো ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইল,—একটু পূর্বে বিমল নিজে যেমন দাঁড়াইয়াছিল—কোন মতেই মনে পড়িতেছে না নামটা।

ঠাকুরদাদার ভ্রূ জোড়া এবার যেন কয়েক সেকেণ্ড বেশি কুঞ্চিত হইয়া রহিল, সেই সঙ্গে অধরের এক প্রান্তে যেন সামান্ত একটু হাসিরও আভাস পাওয়া যায়।

[প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪৩]

আস্তিক

সুলোচন হালদারের বুকেও যে মানুষের হৃৎপিণ্ড ধুকধুক করিতেছিল এ সংবাদ পাইয়া গ্রামের সকলেই অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া উঠিল।

লোকটার কাছে ধর্ম নাই, সমাজ নাই, এমন কি যদি বলা যায় যে আত্মীয়-পরিজনও নাই তো নেহাৎ মিথ্যা বলা হয় না। বাবার মৃত্যুতে তাঁহার ইন্সিওরেন্সের টাকাগুলার কিনারা করিতেই সুলোচন হালদার নাকি এমন মাতিয়া গিয়াছিল যে শ্রাদ্ধটা পর্যন্ত বাদ পড়িয়া যায়। কথাটা শত্রুপক্ষের, ষোল আনাই সত্য নয়; তবে শ্রাদ্ধের পূর্বের ক'টা দিন সুলোচন গ্রামে ছিল

না ; কাজের দিন সকালবেলা কলিকাতা হইতে ফিরিয়াই অনুগত বন্ধু এব পরামর্শদাতা নবীন দত্তকে ডাকাইয়া আনাইয়া বলিল, "নাও, তিলকাঞ্চনে যোগাড়টুকু তাড়াতাড়ি করে ফেল নবীন, আমি গুটি-বারো ব্রাহ্মণ বে আসি। মনে করেছিলাম গাঁয়ের সব ব্রাহ্মণগুলিকে খাওয়াবো—আমার বিশ্বা নেই ওসবে, তবুও একটা সমাজপ্রথা—তা টাকাগুলো এমন গোলমাল কে গেলেন, যদি সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে না পৌঁছোই—জোচ্চোরদের পেটে যায় পরলোক তো আছে নবীন একটা ?—তাঁর কষ্টার্জিত টাকাগুলি যদি তাঁ ঘরে এসে না পৌঁছতো…"

নবীন দত্ত পূরণ করিয়া দিল, "তা হ'লে হাজার ঘটা করে শ্রাদ্ধ করলেও কি তাঁর আত্মার শান্তি হ'ত ?…আর লোক খাওয়াবার কথা নিয়ে তুমি মনে খেদ রেখো না দাদা ;…হ্যাঁ গো, এমনও তো গ্রাম আছে যেখানে বামুনের পাটই নেই, সেখানে তো লোকে মরেও না, তাদের শ্রাদ্ধও হয় না।"

পারিবারিক জীবনটি একটি নিতান্ত পুরাণো পদ্ধতি ধরিয়া বহিয়া চলিয়াছে —পূজা-পার্বনে কি অতিথি-অভ্যাগতে যে একটু বিচিত্রতা আনিবে তাহার উপায় নাই। কাকার টাকা বের করার মতো অবস্থায় পড়িলে সুলোচন পরলোকের নাম করে মাঝে মাঝে, প্রসঙ্গ উঠিলে কথার কথা হিসাবে দেবতাদের কাহাকে-কাহাকেও আনিয়া ফেলে, কিন্তু দেবতারা যখন কাল, লগ্ন প্রভৃতি ঠিক করিয়া নিজেরা আসিতে চান তখন আমল দেয় না। বলে, "তর্কবাগীশ মশাইয়ের শিষ্য—আমার কাছে ওসব ধাপ্পাবাজী খাটিবে না। তা ভিন্ন যাদের নিজেদের একটু উপায় করে নিজের নিজের পেট চালাবার ক্ষমতা নেই, কোথায় কে একটু ভোগ দেবে তার ওপর নির্ভর, তাঁরা আবার আমার উপকার করবেন !—গেছি আর কি !"

লোকটা কখনও প্রবঞ্চিত হয় নাই—সাধু, সন্ন্যাসী, গুণী, গণৎকার ঘেঁসিতে দেয় না, বলে—"আমার বিশ্বাস নেই।" দু-মুঠা ভিক্ষা দিয়া পুণ্যার্জন করিতে চায় না, বলে—"বিশ্বাস নেই।" বাড়িতে অসুখ-বিসুখ করিলে ডাক্তার-বৈদ্যের হাঙ্গাম করে না ; ঐ এক বুলি—"বিশ্বাস নেই।"

মোট কথা, সুলোচন অবিশ্বাসের বেড়া দিয়া খরচের সমস্ত দ্বারগুলি বন্ধ করিয়া নিজের সঞ্চীয়মান অর্থভাণ্ডারের মধ্যে জীবনের প্রায় সবটাই কাটাইয়া দিল। এখন বয়স তাহার পঞ্চাশের কাছাকাছি।

গ্রামের লোক পরোক্ষে তাহাকে এবং তাহার বাক্সবন্দী টাকাকে

অভিসম্পাত করে। প্রয়োজন হইলে গোটাকতক শ্রুতিরোচক কথা বলিয়া চড়া সুদে হাওলাৎ লইয়া যায়। এই ভাবে দিন যায়, এমন সময় এক দিন সুলোচনের স্ত্রী-বিয়োগ ঘটিল।

সুলোচনের স্ত্রী মানময়ী প্রায় বৎসরাবধি নানা রকম জটিল ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন। প্রথমে উপসর্গগুলি সামান্য আকারে দেখা দেয়। অত সূক্ষ্ম জিনিস এ-বাড়িতে কাহারও নজরে পড়ে না, কেহ গা করিল না। যখন জটিলতা দেখা দিল, সুলোচন বেশ ঘটা করিয়া গৌরচন্দ্রিকা করিয়া স্ত্রীকে বলিল, "দেখ, তোমার শরীর তুমিই ভালো বোঝ, বলতো না হয় শহর থেকে বড় ডাক্তারকে নিয়ে আসি। আমি তো মনে করছিলাম নাইতে-খেতে সেরে যাবে; রোগকে যত আস্কারা দেওয়া যায় ততই পেয়ে বসে; কিন্তু ঐ যে বললাম—তোমার শরীর তুমিই ভালো বোঝ, শেষে এমন না হয়…"

মানুষ এক দিনেই চেনা যায়, মানময়ী তো এই লোকের সঙ্গে প্রায় ত্রিশ বৎসর ঘর করিতেছেন; মনের অভিমানটা চাপিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি, কি হয়েছে শুনি যে শহর থেকে সাত তাড়াতাড়ি বড় ডাক্তার এনে ফেলতে হবে? বয়স হয়েছে, এখন তো একটু-আধটু লেগেই দেখা মাঝে মাঝে…"

স্ত্রীর কাছেও একটু চক্ষুলজ্জা হয় এবং সুলোচনের মতো মানুষেরও চক্ষুলজ্জা বলিয়া একটা বস্তু থাকে। পাশের গ্রামের উদীয়মান হোমিওপ্যাথ দীনেনকে ডাকা হইল। সে মাস চারেক আগে আসিলে বোধ হয় কিছু ঠাহর করিতে পারিত। কোন থৈ পাইল না।…সুলোচন কোঁচার খুঁটে চক্ষু মুছিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে নবীন দত্ত এবং আরও পাঁচ-সাতজন যাহারা কাছে ছিল তাহাদের বলিল, "মেয়েদের কথায় কখনই বিশ্বাস করি নি, একবার করলাম, তার ফলও হাতে হাতে পেলাম। কত করে বললাম, 'ওগো, গতিকটা যেন ভালো বোধ হচ্ছে না, যাই, একবার শহর থেকে এ্যাসিস্টেন্ট সার্জেনকে ডেকে আনি।' মাথার দিব্যি দিয়ে ডাকা-গাড়ি ফিরিয়ে দিলে—কি?—না, 'আমার শরীর আমিই ভালো বুঝি, বয়সের দোষে ওরকম একটু-আধটু হয়, আবার নাইতে খেতেই সেরে যাবে'…এই তো সেরে যাওয়া?…উঃ!…"

যাই হোক্ স্ত্রীর শ্রাদ্ধক্রিয়াটা সুলোচন ভালো ভাবেই করিল এবং এই অভাবনীয় ব্যাপারে সকলে বিস্মিত হইল। অবশ্য দানসাগরও নয়, বৃষোৎসর্গও

নয়, তবে গ্রামের ইতর-ভদ্র সবাইকেই এবং পাশাপাশি তিনটি গ্রামের সমং ব্রাহ্মণগুলিকে বলিল। যাহারা একটু ব্যঙ্গপ্রবণ তাহারা বলাবলি করিল "পরিবার আর কাকার মধ্যে তফাৎ আছে বইকি!" অনেকে সোজাভাবে লইল ব্যাপারটা, বলিল, "যাই হোক্, মানুষের চামড়া গায়ে আছে বলতে হবে। স্ত্রীর বেলাও যদি অষ্টরম্ভা দেখাতো তো কে কি করতে বলো?"

অভিমত যে যাহাই দিক, কি করিয়া যে ব্যাপারটা সম্ভব হইল সেটা গ্রামের সকলেরই একটা গভীর সমস্যা এবং গবেষণার বিষয় হইয়া রহিল।

জ্ঞাতি-ভোজনের দিন কতকটা আভাস পাওয়া গেল।—

আহারের পর সকলে আসিয়া বৈঠকখানায় বসিয়াছে, পান-তামাকের সঙ্গে গল্প চলিতেছে। ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, "না, কাজটি তুমি বেশ সুচারু-ভাবেই করেছ সুলোচন, কাল অনাথকে আমি সেই কথাই বলছিলাম,—বলি, সুলোচনের প্রাণ আছে, বৌমার কাজটা যেভাবে করলে…।"

নবীন দত্ত ঠিক তাল বোঝে, বলিল, "তা যদি বললেন ক্ষেতু-কাকা, সুলোচনদাদার কবে কোন্ কাজটাই খেলো হয়েছে?"—সকলের মুখের উপর একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া বিজ্ঞভাবে একটু হাসিল।

এর পূর্বে যে আবার সুলোচন কবে কি কাজ করিয়াছে—কাহারও মনে পড়িল না। তবে অবস্থাটা অনুকূল নয় বলিয়া সে কথাটার আর কেহ উচ্চ-বাচ্য করিল না।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, "তা যে হয়েছে তা তো বলছি না, মন দরাজ হ'লে কাজ ভালো না হয়ে উপায় নেই। তবে এবারকার এ কাজটা যেন আরও উৎরে গেছে। বলতে পারি না আমার মনের ভ্রম কি না, তবে…"

"ভ্রম নয়, এর রহস্য আছে।…দাও, অনেকক্ষণ হয়েছে"—নবদ্বীপ ক্ষেত্র-মোহনের হাত থেকে গড়গড়ার নলটা লইয়া দুইটা টান দিয়া বলিলেন, "ভ্রম নয়, এর রহস্য আছে। যাঁর কাজটি হ'ল, তিনি কত বড় সতীলক্ষ্মী মেয়ে ছিলেন? তিনি ওপর থেকে দেখছেন না? এই যে একটা কাজে সাতখানা গ্রামে সাড়া পড়ে গেল, এতে তাঁর পুণ্যি, তাঁর ভাগ্যি কাজ করছে না? সুলোচন রাগ করুক, কিন্তু এর সবটুকু যশ তো আমি তাকেই দিতে পারছি না…"

সুলোচন বাইরে বাইরে কতকটা অনাসক্ত ভাবে নিজের যশোগীতি শুনিয়া যাইতেছিল, এই সুবিধাটুকু আর হাতছাড়া করিল না। একটু নড়িয়া

বসিয়া বলিল, "নবদ্বীপ কাকা ভাগ্যির কথা বলায় মনে পড়ে গেল। ওসব কি আগে কিছু বিশ্বাস করতাম? তর্কবাগীশ মশাইয়ের শিষ্য আমরা, শিখিয়েছিলেন—এক আছে প্রকৃতি আর আছে পুরুষ, বাকি সব বাতিল; ও সব যাগযজ্ঞি, পূজো-পার্বণ, ঘটক-পুরুত—সব বুজরুকি। গণৎকার তো তাঁর ত্রিসীমানার মধ্যে আসতে পারতো না। তাঁর কাছ থেকে সেই ধাত পেয়েছিলাম, পরলোকও মানি নি, ভাগ্যিও মানি নি, নিজের অহংকারেই কাটিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি না মানলেই তো বিধির বিধান পালটে যাচ্ছে না। মানাবার যিনি কর্তা তিনি এমন ভাবে মানিয়ে দিলেন যে…"

কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হইয়া আসায় আর শেষ করিতে পারিল না। সকলে সান্ত্বনা দিল—আর খেদ করিয়া কি হইবে? যাহার যত দিন সুখদুঃখের ভোগ এ সংসারে তাহার এক দিন বেশি থাকিবারও উপায় নাই, এক দিন কমও নয়। তিনি পুণ্যবতী ছিলেন, ভালোই গিয়াছেন; এখন, যে কুচোকাচা-গুলিকে রাখিয়া গিয়াছেন সেগুলির মুখ চাহিয়া সব সহ্য করিয়া যাইতে হইবে, ইত্যাদি।

সুলোচন নীরবে সব শুনিয়া গেল, তাহার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "অথচ সে গণৎকারটা সবই বলে গেল, স্পষ্ট না বলুক, একটু ঘুরিয়ে বললে, তা তখন যদি বিশ্বাস করে একটু ভালো করে শুনি তো একটা কাটান-টাটান হ'তে পারে। কিন্তু কিছুই কখনও আমল দিই নি—বিড়্যাল বকছে বলে খেদিয়ে দিলাম ব্রাহ্মণকে, এখন…"

আবার গলা ধরিয়া আসায় থামিয়া গেল। নবদ্বীপ বলিলেন, "যাক, শোকের আলোচনা করে আর মন খারাপ করবার দরকার নেই। মতিগতি মানুষের বদলায়ই, এখন ভগবানের ওপর ভরসা রেখে চলো, তিনিই সব সামলে দেবেন। যা হয়ে গেল তার জন্যে আর…"

সুলোচন আর একটা নিরুপায়ের দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যা হয়ে গেল তার জন্যে তো আমি ভাবছি না নবদ্বীপ কাকা, সে তো হয়েই গেল; তর্ক-বাগীশ মশাইয়ের শিক্ষাই ছিল—গতস্য শোচনা নাস্তি; যা বাকি আছে, স্পষ্টাক্ষরে তা দেখতে পাচ্ছি ঘটবেই—তারই জন্যে এখন ভাবনা। শেষকালে বুড়ো বয়সে কি এই ছিল কপালে—উঃ!"

সকলেই দুঃখ না করিতে জেদাজেদি করায় সেদিন কথাটা ঐ পর্যন্ত রহিল।

নবীন দত্ত দিন পনেরর জন্য বাহিরে নিজের কি কাজে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিলে সুলোচন রহস্যটা আর একটু ভাঙিল। বলিল, "যতই মিলিয়ে দেখছি, ততই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, নবীন। শাস্ত্র বলি তো একে, সবার মুখেই এক কথা। আর আশ্চর্য, ঠিক এই কথাটিই সে লোকটাও হাত গুনে বলেছিল। তখন তো আর এসবে বিশ্বাস ছিল না। নেহাৎ—'হাতটা দেখি এক বার' বলে ফ্যাচাখেউ করে তুললে, দিলাম বাড়িয়ে—বড়্ বড়্ করে বকে গেল, শুনে গেলাম। তার পরে যখন ফললো, চোখ খুলে গেল। ভগবান যেন চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন—'হ্যাঁ, বড় নাস্তিক হয়েছিস? তবে দেখ্'!"

ধীরে ধীরে হুঁকা টানিতে লাগিল। কথাগুলার মধ্যে উদ্দেশ্যের কোন সন্ধান না পাইয়া, কোন্ ফাঁকে সেটা বাহির করিয়া লইবে নবীন দত্ত মনে মনে তাহারই উপায় খুঁজিতেছিল, সুলোচন নিজেই সেটা আরও পরিষ্কার করিয়া দিল। হুঁকাটা সরাইয়া চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া বলিল, "স্পষ্ট বললে হে—দ্বিতীয় বার দার-পরিগ্রহ; হস্তরেখা বলছে, কোন উপায় নেই।...একেই মানি না ওসব, তার ওপর ওরকম অলুক্ষণে কথা শুনে আরও ভক্তি গেল চটে; বললাম—'পঞ্চান্ন পেরিয়ে এখন যাটের ধাক্কা চলেছে, দ্বিতীয় বার দার-পরিগ্রহ মানে?'...ভাগিয়ে দিলাম। মাসখানেকও গেল না, গিন্নী বাদ সাধলেন। কে জান্‌তো বলো এ সব? এখন এই হাতে হাতে প্রমাণ, বিশ্বাস না করেই বা কি করি বলো?"

নবীন দত্ত চেনে, ব্যাপারটা বুঝিল। বলিল, "কথায় বলে, 'দৈবং কেন বাধ্যতে?' আমরা না মানলেই তো হবে না দাদা। বলে—যা ভবিতব্যি..."

সুলোচন বলিল, "তবে ভবিতব্যি বলেই যে এক কথায় মেনে নিয়েছি এমন নয়। গিন্নীর কাজটা শেষ হ'লে আরও ক'জনকে দেখালাম হাতটা—দেখি না, যদি একটা লোকও 'না' বলে। উঁহু, সব শেয়ালের এক রা!"

নবীন বিজ্ঞের মতো বলিল, "তবেই বুঝুন, সবার মুখেই যখন এক কথা..."

"হুবহু এক কথা, তবে আর বলছি কি? সবার কাছে এক এক কলম লিখিয়েও রেখেছি, এই দেখ না।"

সুলোচন উঠিয়া গিয়া একখানা কাগজ লইয়া আসিল। ইংরেজি, সংস্কৃত বাংলায় সাত আটজন লম্বা লম্বা পদবীধারী জ্যোতিষী-গণৎকারের অভিমত—

দার-পরিগ্রহ অনিবার্য। নবীন দত্তের কোথায় একটা হাসি ঠেলিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু হাসিকে আস্কারা দিলে সে সুলোচনের মন্ত্রী হইতে পারিত না। অভিমতগুলীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। একটু পরে সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, "একটা কথা বাদ দিয়েছেন, তাই দেখছিলাম।... আপনি যা আপনভোলা লোক!"

সুলোচন একটু উৎসুকভাবে প্রশ্ন করিল, "কি আবার ছাড়তে দেখলে তুমি? পাঁচ জনে আমার ঘাড়েই ফেলবে জেনে তো লিখিয়ে পর্যন্ত নিলাম,—ভাববে বুড়ো বয়সে শখ হয়েছে। এদিকে আমি যে কী এক সমস্যায় পড়ে গেছি..."

নবীন দত্ত তিরস্কারের স্বরে বলিল, "ঘটনাটা ঘটবে কবে সেটা জেনে নিতে হয় তো? জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ দৈবাধীন ব্যাপার; যে সময় ঘটনাটি ঘটবার, না জেনে বোধ হয় লঙ্ঘন হয়ে গেল। সেই মানলেন, অথচ শুভ কাজে একটা প্রত্যবায় দোষ ঢুকে রইল..."

সুলোচন যেন একটা দ্বিধায় পড়িয়া কি চাপিতে চেষ্টা করিতেছিল, অবশেষে সেটুকু কাটাইয়া উঠিয়া বলিল, "করেছিলাম জিগ্যেস নবীন, অর্থাৎ যত দেরি হয় ততই তো ভালো?—তাই করেছিলাম জিগ্যেস, এক জন তো বলে মাসখানেকের মধ্যেই করতে হবে। তা কখন পারা যায়? তুমিই বলোনা?...কেউ আবার বলছে ছ-মাস লাগবে। মোট কথা, সময় নিয়ে সবার মতের মিল নেই দেখে ভাবলাম ওটা আপাততঃ হাতে রাখা যাক, দু-দিন পরে এক জন ভালো জ্যোতিষীকে দেখিয়ে ঠিক করা যাবে, তাড়া কিসের?...তা ভিন্ন তুমিও ছিলে না, মনটাও এই দুর্গ্রহে পড়ে ঠিক নেই..."

নবীন দত্ত বলিল, "অবিশ্যি এ যা বলছেন, এ একটা সুযুক্তির কথা,—যখন সময় নিয়ে ওদের সবার মিল হচ্ছে না তখন একটা ভালো লোক দিয়ে গুনিয়ে ঠিক করে নেওয়াই ভালো দাদা, আমার আছেও জানা ভালো লোক—দণ্ড-পল পর্যন্ত গুনে বলে দেবে। কিন্তু একটা কথা বলিয়ে নোব তবে এ কাজে হাত দোব দাদা;—সে যা বলবে সেটি মেনে নিতে হবে। তুমি রাগ করবে করো দাদা, আমার বিশ্বাস তোমার নিষ্ঠার অভাবেই বৌদি আমাদের অকালে ছেড়ে গেলেন। হয় লগ্ন নিয়ে, নয় অন্য কোন খুঁটিনাটি নিয়ে একটা কিছু বিভ্রি হয়েছিল, নইলে তাঁর কি এটা যাবার বয়েস? আজ তাঁকে বিদায় দিয়ে কি নতুন বৌদি ঘরে আনবার কথা আমার?"

নবীন দত্ত চোখে কোঁচার খুট দিল। তামাক টানিতে টানিতে সুলোচন হালদারও একবার চোখের কোণগুলা মুছিয়া লইল।

দু-দিন পরেই নবীন দত্ত সনাতন গোঁসাই নামে একজনকে আনিয়া হাজির করিল। বলিল, "পণ্ডিতপাড়ায় বাড়ি, নামী গুণী।"

গোঁসাই অবিশ্বাসের জন্য সুলোচন হালদারের উপর গোটাকতক কাটা-কাটা বুলি ঝাড়িয়া হাতটা লইয়া যত-দূর সম্ভব দূরে ঠেলিয়া ধরিয়া তীর্যক নেত্রে চাহিয়া রহিল। অনেক বুলি আওড়াইল, অনেক আঙুল নাড়িল, তাহার পর আবার গোটাকতক বুলি আওড়াইয়া বলিল, "দুই মাস, আট দিন, সতের ঘন্টা, তেইশ মিনিট, চার সেকেণ্ড, সাত পল, তেরো অনুপলের মধ্যে বিবাহ অনিবার্য!"

নবীন নিতান্ত কৌতুহলবশে একটা পাঁজি আনাইল। হিসাব করিয়া দেখা গেল ঠিক ঐ সময়ে একটি বিবাহের দিন পাওয়া যাইতেছে! নবীন বলিল, "দাদা, এতেও তুমি যদি গণনা বিশ্বাস না করো তো কি বলবো? এ লগ্ন হাত ছাড়া করলে আবার একটা দুর্বিপাক এনে ফেলবে। বিধির নির্দেশ যখন এত স্পষ্ট, তখন আর অমত কোরো না তুমি, দোহাই।"

সুলোচন গোঁসাইকে পাঁচটি টাকা বিদায় দিয়া চক্ষে কোঁচার খুট দিয়া বলিল, "ওফ্, এতও লেখা ছিল কপালে!"

গণৎকারে বিশ্বাস করে না এমন চ্যাংড়ার সংখ্যা গ্রামে কম অল্প নয়। নবীনের পরামর্শে শুভ কাজটা যথাসম্ভব সংগোপনেই হইল। তবে বৌভাতের দিন সুলোচন আবার বেশ এক চোট ঘটা করিল। ব্যবস্থা করিতে, নেমন্তন্নর —ফর্দ করিতে পাড়ার গণ্যমান্যেরা একত্র হইয়াছে, ক্ষেত্রমোহন, নবদ্বীপ, আরও সব। নবীন দত্তও আছে।

নবীন বলিল, "রাজি কি করতে পারি? এক হাত এগোন তো সাত হাত পেছিয়ে যান।...এখন শুভ কাজটা সুভালোয় ভালোয় উৎরে গেলে বাঁচা যায়।"

ক্ষেত্রমোহন গড়গড়া থেকে মুখটা সরাইয়া বলিল, "যাবে উৎরে। কত বড় সতীলক্ষ্মী ঘরে এসেছেন! এতো আর অন্য কেউ নয়, আমার সেই মা-ই। সুলোচন সেদিনকার ছেলে, শাস্ত্র না মানুক—স্ত্রীর যেমন সেই এক স্বামী, পুরুষেরও ঠিক তেমনই সেই একই স্ত্রী কি না, শুধু ভিন্ন মূর্তি নিয়ে আসেন..."

সুলোচন বলিল, "আর অবিশ্বাসের পাট উঠিয়ে দিয়েছি, কেতুকাকা, যা-শিক্ষা পেলাম। আস্তিকের বংশ আমরা, তর্কবাগীশ মশাই যে কী নাস্তিকতার বিষ ঢুকিয়ে গিয়েছিলেন মনে!..."

চারিটি আঙুল দিয়া চক্ষের জল মুছিয়া একটি বুকভাঙা দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিল।

[প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪৯]

কালস্য গতিঃ

লেখা চাই।

কিন্তু কল্পনার সে মুক্ত আকাশ-বিহার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেখানে প্রলয়ের ঘনঘটা, সুকুমার সাহিত্যের জন্ত অভিযান বিড়ম্বনা মাত্র। এই আতঙ্কে-অবরুদ্ধ মনকে দিয়া সৃষ্টি করাই কি করিয়া? ওপার হইতে তাগিদ আসিতেছে ঘন ঘন অমোঘ হুংকারে। এই যে 'গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা' অবস্থা, এতে বরং একটু পরকালের চিন্তা করাই শাস্ত্র-সংগত, লেখার কথা ভাবিব এমন অবসর কই? কিন্তু লেখা চাই-ই।

আকাশ তো গিয়াছেই, যেটাকে ভূতল বলা হয়, সেটাও ত্যাগ করিয়া পাতালে আশ্রয় লইয়াছি। পাতাল শুনিতাম মৃত্যুর দোসর। সম্পূর্ণ না হউক্, কথাটা অর্ধসত্য তো বটেই। ভাবিয়াছি, দেখাই যাক না—এই সশব্দ সাগ্নিক মৃত্যুর নিকট হইতে পলাইয়া শব্দহীন হিমস্পর্শ অর্ধমৃত্যুর আশ্রয়ে কোন একটা সুরাহা হয় কি না।

হেঁয়ালি নয়, সত্যই বোমার ভয়ে নিচের তলা আশ্রয় করিয়া আছি। নিচের তলা বলিলে ব্যাপারটা বেশ পরিষ্কার না-হইবারই কথা। যুগ যুগ ধরিয়া এতদিন পর্যন্ত লোকে যেটাকে 'নিচের তলা' বলিয়া আসিয়াছে, শুধু বাঁচিবার আশায় তাহারও নিচে একটি গৃহ নির্মাণ করিতে হইয়াছে। মানুষের উপরের গতি শেষ হইয়াছে। তবু মানুষই তো! সে চলিবেই। তাই আধুনিক প্রগতির লক্ষণ অধোগতি; ঘরবাড়িও সেই তালে পা ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এতদিন আকাশ লক্ষ্য করিয়া উঠিতেছিল, এবার তাহার লক্ষ্য পাতাল।

ক্রমাগতই অবান্তর কথায় আসিয়া পড়িতেছি। কি করি? অগ্নির আঁচ হইতে নিজেকে অপসারিত করিয়াও গায়ের জালা মিটিতেছে না। কারণটা আপাততঃ বোমাও নয়, সাইরেনও নয়—যদিও উভয়ের সঙ্গেই একটা সূক্ষ্ম সম্বন্ধ আছে। শরীর এবং মনকে সংকুচিত করিয়া লইয়া সম্পাদক মহাশয়ের তাগিদ মিটাইবার যোগাড়যন্ত্র করিতেছি, আমার ভূতলাশ্রিত পরিবার-মহলে একটা গোলযোগ উঠিল। মা বলিতেছেন, "জানি না বাছা, কেমন যেন কালেরই দোষ! ছেলে কোথায় তার ঠিক নেই, তার মুখের কথা হ'ল—'সেপাই হব, যুদ্ধু করতে যাবো!'...তা যাবি, সব বীরপুরুষ হয়েছিস্, আটকাবে কে? কিন্তু তার আগে আমায় যেতে দিন ভগবান..."

কন্যা বোধ হয় স্কুল হইতে এইমাত্র ফিরিয়াছে—পড়ার ঘরের ভিতর হইতে উত্তর দিতেছে, "কথায় কথায় একালের নিন্দে তোমার একটা রোগ দাঁড়িয়েছে, ঠাকুমা। না, যুদ্ধে যাবে কেন? চারিদিকে অন্যায়ের আগুন লেগেছে, ও তোমাদের কালের কর্তাদের মতো বসে বসে চণ্ডীমণ্ডপে তামাক পোড়াতে শিখুক, আর..."

আমার কনিষ্ঠ পুত্র দোতালায় কি একটা আবদারের সঙ্গে পরিত্রাহি চীৎকার করিয়া যাইতেছে। স্পষ্ট শুনিতে না পাইলেও বুঝিলাম, সমস্ত ব্যাপারটা তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া।

ঠাকুরমা-নাতনীর কথা-কাটাকাটি ক্রমে রসিকতায় গড়াইয়া পড়িলেও, উহারই মধ্যে বেশ ঝাঁঝালোও। আমার বয়সটা মায়েরই বেশি নিকটবর্তী; মাথায় বোমা পড়া অপেক্ষা মেয়ের মাথায় এই সব আজগুবি আধুনিকতার সমাবেশ কম বিপজ্জনক মনে করি না। এরা কি দেশটাকে রাতারাতি নব্য তুর্কী করিয়া গড়িয়া ফেলিতে চায় নাকি? আমাদের এই পাতাল-প্রবেশের সুযোগে ইহারা আরও কি সব বিপ্লবী মতলব আঁটিতেছে, কে জানে? নিচে হইতে গলাটাকে রাশভারী করিয়া বলিলাম, "কমলী, সব শুনছি। মনে হচ্ছে, নিজেও তা হ'লে বোধ হয় নারী-বাহিনী কি ঐ রকম একটা কিছু তোদের চুলোয় প্রগতির ব্যাপারে নাম লিখিয়ে এসেছিস্। কাল থেকে স্কুল যাওয়া বন্ধ, বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। একটা এ-আর-পি.-তে নাম লিখিয়েছে; আমার মাথার ঠিক নেই, এর ওপর যদি তোর মুখে শুনব..."

কন্যার মাতা দুয়ারের কাছে উপস্থিত হইল, কোলে ক্রন্দনপরায়ণ শিশুপুত্র। ভর্ৎসনা-সহকারে বলিল, "সামলাও বীরপুরুষ ছেলেকে, নাজেহাল

করে দিয়েছে। দোষ ঠাকুরপোর, ওকে সঙ্গে করে নিয়ে হাসপাতালে গেছে, আরও কোথায় কোথায় নিয়ে গিয়ে লড়াইয়ের সব যন্ত্রপাতি, উড়োজাহাজ, গ্যাস-মুখোশ—এই সব দেখিয়েছে। ভাইপোর এখন শখ হয়েছে, সেপাই সেজে লড়াই করতে যাবো, জাপানীদের মারবো। পায়ে একটা ন্যাকড়া জড়িয়ে চোট-খাওয়া সেপাই হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, অলক্ষণ বলে মা যেই সেটা কেড়ে নিয়েছেন, আর…"

বলিলাম, "তোমাদের কাণ্ডখানা কি গো! একটা তিন বছরের শিশু লড়াইয়ে যাবে বলে বায়না ধরেছে, মা, ঠাকুমা, বোন সবাই মিলে বাড়িতে ডাকাত-পড়া লাগিয়ে দিয়েছ! আমি মনে করি, বড়খোকাই বুঝি বা বন্দুক ঘাড়ে করে যুদ্ধ করতে চললো; যাও, বাজে গোলমাল বন্ধ করো গিয়ে।"

ছেলেটা আমাদের কথাবার্তা শুনিবার জন্য গলাটা নরম করিয়াছিল, সুরটা ধরিয়া রাখিয়াছিল, তাহাকে ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে প্রশ্ন করিলাম, "বড় বীর হয়েছ, না? সেপাই সেজে লড়াইয়ে যেতে হবে?"

কথাটা সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

উহার মাতাকে বলিলাম, "নিয়ে যাও তোমার অভিমন্যুকে, আমায় বিরক্ত কোরো না, একটা কাজ নিয়ে বসেছি।"

বলিল, "বলছি—দেখ একটু, কোনমতেই থাকবে না আমাদের কাছে, ঠাকুরপো ওর মাথায় যে কি খেয়াল সঁাধ করিয়ে দিয়েছে! নিজে তো বোমা মাথায় করে হুড়্দুম করে বেড়াচ্ছে এ-আর-পি নিয়ে, কে যে সামলায় ভাইপোকে, ছিষ্টির পাট পড়ে আছে।"

বলিলাম, "কমলীকে দাওগে, আমার এখন মরবার ফুরসৎ নেই, যাও।"

উপরে পৌছিতে না পৌছিতে ছেলে সুর চড়াইল এবং মায়ের কাছে একটা চাপড় খাইয়া সেটাকে সপ্তমে ঠেলিয়া তুলিল, ধুয়া—"লড়াই-করা ছেপাই হবো, বোমা কখন কাটবে?"

রাগ চাপিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু মনটা ক্রমেই অধিকতর উষ্ণ হইয়া উঠিতেছে, একটা সামান্য শিশু যে এর মূলে—এ জ্ঞানটুকুতে ফল হইতেছে না, মায়ের মতোই সমস্ত যুগটার উপর মনটা বিষাইয়া উঠিতেছে, কলম এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। কমলীর গলা শুনিতেছি, ছেলে

ভোলাইবার সমস্ত কলা-ই ভাইয়ের উপর পরীক্ষা করিতেছে বেচারি; ভাইয়ের সেই এক কথা—"নড়াই-করা ছেপাই হবো, বোমা কোথায়?"

মা আরও চটিয়াছেন, একালের সঙ্গে আরও নানারকম ব্যাপার টানিয়া আনিয়াছেন। ওর নিজের মাত্তাও ক্রমেই অধিকতর উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে, তাহার মন্তব্যের মধ্যে ছেলের পিতার উল্লেখ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। বোনও এক-একবার বিরক্ত হইয়া ঝাঁঝিয়া উঠিতেছে। সকলের উপর ছেলের কণ্ঠস্বর, যেমন উৎকট তেমনই উচ্চ—সব মিলিয়া বাড়িটা একটা ছোটখাট কুরুক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কলম রাখিয়া দিলাম। হাঁকিলাম, "কমলী, নিয়ে আয় হতভাগাকে, যুদ্ধের খানিকটা নমুনা ওকে দেখাই—অতিষ্ঠ করে তুলেছে! আনলি?"

মা চেঁচাইয়া উঠিলেন, "খবরদার, এর ওপর মারধোর করবি না শৈল, ছেলে আবদেরে কাঁদুনিতে হাক্লান্ত হয়ে উঠে এমনিই ভিরমি যাওয়ার দাখিল হয়েছে। আমায় যেতে দে, তারপর যা খুশি করিস, বলতে আসবো না।"

রাগিয়া বলিলাম, "তা হ'লে কি করতে বলো? ঠাণ্ডা কথায় তো তোমরাও হার মেনেছ। বাড়িতে কাক-চিল বসতে দিচ্ছে না, এমন করে কতক্ষণ..."

উহার মাতা কমলীর নিকট হইতে ছেলেটাকে টানিয়া লইয়া এবার একেবারে নিচে নামিয়া আসিল, আমার পায়ের নিকট ধপ করিয়া বসাইয়া দিয়া চাপা ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "কেন, যত সব আদাড়ে গপ্প লিখে লিখে দেশের তাবৎ বুড়োদের মন ভোলাচ্ছ, একটা শিশুকে ঠাণ্ডা করবার হদিস জানো না? না, তাতে যে গেরস্তর একটু উব্‌গার হবে!"

মেজাজের উপর এখ্‌তিয়ার ছিল না, একটা রাগারাগি করিতে যাইতে-ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ পায়ের কাছে ছেলেটার মুখের উপর দৃষ্টি পড়ায় নিজেকে সামলাইয়া লইলাম। উপর হইতে সহসা এই প্রায়ান্ধকার পাতালপুরীতে আসিয়া এবং বাপ-মায়ের উগ্র দৃষ্টির মাঝে পড়িয়া সে যেন কিংভূতকিমাকার হইয়া গিয়াছে। কান্নাটা একেবারে থামিয়া গিয়াছে এবং অবরুদ্ধ কান্নার আবেগে মুখটা সিঁদুরবর্ণ হইয়া গিয়াছে; উদগত অশ্রুকে ঠেলিয়া রাখিবার জন্ত এক-একবার ঢোঁক গিলিতেছে এবং এক প্রকার অসহায় আর্ত দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া আছে।

অবস্থাটা যেমন করুণ, তেমনই আশঙ্কাজনক। আমি উহার মাতাকে বলিলাম, "আচ্ছা, যাও, সবার মুরোদ বোঝা গেল ; একটা ছেলেকে ঠাণ্ডা করতে হবে, সেখানেও শর্মা না হ'লে চলবে না।"

উত্তর যাহা পাইলাম, তাহা এ কাহিনীর পক্ষে অবান্তর বলিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম না।

খোকার জননী চলিয়া গেলে উহাকে উঠাইয়া লইয়া নরম কণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, "কাঁদছিলে কেন খোকা ? কি হয়েছে ? গল্প শুনবি একটা ?"

খোকা একবার ভালো করিয়া ফোঁপাইয়া লইয়া রুদ্ধ দমটাকে মোচন করিল, উত্তর করিল, "হুঁ।"

ঔষধ ধরিয়াছে দেখিয়া উৎসাহের সহিত বলিলাম, "তা বেশ তো, শুনবি, এর জন্যে কান্না কেন ? এমন সব বেয়াক্কেলে, খোকা গল্প শুনবে, তাকে উল্‌টে ধমকাচ্ছে ! আয়, কোলে আয়।"

খোকা উঠিয়া কোলে গুছাইয়া বসিল। আর কালক্ষেপ না করিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিলাম।—

"মস্ত এক তেপান্তরের মাঠ। তার এক ধারে প্রকাণ্ড এক অশথ-গাছ ; কতদিন থেকে যে এক ভাবে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, কেউ বলতে পারে না। সেই আদ্যিকালের অশথগাছে—বুঝেছিস্ খোকা ?—এক থাকতো ব্যাঙ্গমা আর এক থাকতো ব্যাঙ্গমী। আহা, সব্বাই তো চায় আমাদের খোকার মতো লক্ষ্মী একটি ছেলে হোক্ ? কিন্তু দিন যায়, মাস যায়, বছর ঘুরে যায়, ছেলে আর তাদের হয় না। দুঃখে, মনের কষ্টে দুজনে একটা ডালের ওপর বসে হাপুস নয়নে কাঁদে—হাপুস নয়নে কাঁদে—হাপুস নয়নে..."

খোকা মুখ নিচু করিয়া শুনিতেছিল, হঠাৎ যেন মনে হইল, চাপা কোঁপানির আওয়াজ শুনিলাম। রচনা যে এত হৃদয়স্পর্শী করিয়া তুলিতে পারিয়াছি, ইহাতে পুলকিত হইয়া মাথাটা নামাইয়া বলিলাম, "তুইও কাঁদছিস নাকি খোকা ? কান্না কিসের ? এক্ষুনি হবে ওদের ছেলে।"

খোকার ঠোঁটটা কাঁপিয়া উঠিল, কান্নার ভাবটা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিল, "কুড্ডুর গপ্প শুনবো, এরোপেল্লেনের..."

বুড়া বয়সের ব্যক্তি, ওদিকে যা এখনও এযুগের কথা লইয়া গরগর করিতেছেন।

কতকটা রচনার অমর্যাদাজনিত নৈরাশ্যে, কতকটা এই এক ফোঁ ছেলের বেয়াড়া জিদে খানিকক্ষণ বাক্‌স্ফূর্তি হইল না। ইচ্ছা হইল, ঘাড় ধরিয়া একটা আছাড় দিয়া এরোপ্লেনের খানিকটা আস্বাদ দিয়া দিই—নগদ নগদি। নিজেকে অনেক কষ্টে সংবৃত করিয়া লইলাম। একটু চিং করিলাম, তাহার পর স্থির করিলাম, এমন উগ্র গল্পের অবতারণা করিব যে আতঙ্ক মিটিতে কিছুটা দিন কাটিয়া যাইবে। বলিলাম, "বেশ, এরোপ্লেনে গল্পই বলছি, এ আর এমন শক্ত কি? তবে শোন্"—বলিয়া সুরটা যথাসম্ভ গুরুগম্ভীর এবং চক্ষু যথাসম্ভব আয়ত করিয়া আরম্ভ করিলাম।—

"তুই তখন ঘুমুচ্ছিলি খোকা। হঠাৎ কড়কড় কড়কড় কড়াৎ! আকাশ যেন চৌচির হয়ে ফেটে গেল! সে যে কি ভয়ংকর আওয়াজ, তোকে কি বলবো! ধড়মড়িয়ে সবাই উঠে পড়ে পড়ি-তো-মরি করতে করতে গেলাম ছুটে। ছাতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ! চড়কগাছ দেখিস নি তো কখনও? দেখাবো একদিন, সেই আকাশ পর্যন্ত উঠে বনবন করে ঘুরতে থাকে। ছাতে উঠে সবার চক্ষু চড়কগাছ! হবে না? একটা নয়, দুটো নয়, একেবারে পঞ্চাশখানা এরোপ্লেন আকাশে উঠে…"

খোকা শোধরাইয়া দিল, "হাজাল খানা।"

কটু এবং গুরুপাক হইলেও ডেঁপোমিটা হজম করিয়া গেলাম। মনের রাগ মনে চাপিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস, হাজার খানা এরোপ্লেন আকাশে উঠে সে কি তর্জন-গর্জন আর ডানা ঝাপটানি! এরোপ্লেনে এরোপ্লেনে সমস্ত আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল, আর তালগাছের মতো বোমা সব আগুন ছড়াতে ছড়াতে দুমদাম করে ফাটতে ফাটতে নিচে এসে পড়তে লাগলো। যেখানটা পড়ছে, বুঝেছিস্ কিনা খোকা, ভেঙে-চুরে একাকার করে দিচ্ছে! ওদিকে বোমা-ফাটার বিদকুটে শব্দ, এদিকে দোতলা, তিন-তলা, চারতলা বাড়ি পড়ার হুড়মুড়নি, ভয়ে আতঙ্কে আমরা তো…"

খোকা গলাটা একটু দোলাইয়া নাকী সুরে অনুযোগ করিল, "আমাদের বাড়ি পললোনা?"

কি অলক্ষণে কথা কচি ছেলের! তবু, আর ঘাঁটাইলাম না, বলিলাম, "না, আমাদের বাড়ি পড়বে কেন? আমাদের বাড়ি খোকার মতন লক্ষ্মী ছেলে রয়েছে, ঠাকুর বাঁচিয়ে দিলেন।"

খোকা তেমনই অনুযোগের স্বরে মন্তব্য করিল, "ঠাকুর দুষ্টু।"

প্রসঙ্গটা আর না বাড়াইয়া বলিলাম, "তারপর কি হ'ল শোন্ খোকা। জাপানীরা যখন ওপরে খুব বাড়াবাড়ি লাগিয়েছে এই রকম, নিচে থেকে দশ হাজারখানা এরোপ্লেন বন্দুক ছুঁড়তে ছুঁড়তে তরতর করে ওপরে উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ওদের আরও এরোপ্লেন সব এসে পড়লো, এদেরও আরও হাজার হাজার এরোপ্লেন উঠলো, ওদেরও আরও সব কোথা থেকে এসে জুটলো, আরও এদের, আরও ওদের—এরোপ্লেনে এরোপ্লেনে আকাশে আর এত্তোটুকু জায়গা নেই! তারপরে বেধে গেল ভীষণ যুদ্ধ, সে যে কী ভীষণ তোকে কি বলবো খোকা! হাজার হাজার বোমা ফাটছে, লাখো লাখো কামানের গোলা ছুটছে, ঝাঁকে ঝাঁকে এরোপ্লেন ডানা ভেঙে ওলটাতে পালটাতে কত বাড়ি ভেঙে, কত ঘোড়া, মোষ, মানুষ মেরে নিচে এসে পড়ছে, হাজার হাজার মানুষ ওপর থেকে ছিটকে যে কোথায় গিয়ে পড়ছে ঠিকানা নেই, কারুর মুণ্ডু উড়ে গেছে, কারুর পা নেই, কারুর হাতের একখানা কেটে বেরিয়ে গেছে, কারুর বুকের ওপর গোলা লেগে হাড় পাঁজরা সব..."

একবার আড়চোখে চাহিলাম, ঔৎসুক্যে ভরা কিন্তু ভয়লেশহীন দুইটি চক্ষু আমার মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া খোকা বসিয়া আছে, থামিতে সামান্য যে একটু রসভঙ্গ হইল তাহাতেই খানিকটা অধৈর্যভাবে তাগাদা দিল, "হুঁ, তালপল?"

বিরক্তিটা আর চাপিতে পারিলাম না। না হয় কান্নাটাই থামিয়াছে, কিন্তু এত ফালাও করিয়া গল্প বলিবার তো আমার আরও কিছু উদ্দেশ্য ছিল! আর, বিভীষিকা-সৃষ্টির আমার যতটুকু ক্ষমতা তাহারও চরমে আসিয়া পড়িয়াছি, সবই জলে পড়িতেছে তো! ভয়ের সঞ্চার কোথায়? গল্পটা গুটাইয়া লইলাম, বলিলাম, "তারপর আর কি? অত হুলুস্থুলের মধ্যে কি কেউ বাইরে দাঁড়িয়ে বেশিক্ষণ তামাশা দেখতে পারে? আমরা তাড়াতাড়ি হুড়মুড়িয়ে নেমে এসে এই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। মাঝে মাঝে গুমগাম শব্দ শুনছি, আর ঠাকুরকে বলছি, ঠাকুর, আমাদের সবাইকে বাঁচিয়ে রাখো।"

খোকা অপ্রসন্ন মুখে একটু চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর আমার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "আল কাকা?"

উদ্দেশ্যটা বুঝিলাম, এবং কোথায় একটু লজ্জাও অনুভব করিলাম। কাকা ওর আদর্শ, ওর হীরো, তাহাকে আমাদের—পলাতকদের—দলে টানিয়া আর

ওকে নিরাশ করিতে মন সরিল না। বলিলাম, "না, কাকা তোমার এলোন সেও একখানা এরোপ্লেনে বন্দুক-বোমা নিয়ে ওপরে উঠে গেল আর জাপানী দের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে দিলে।...এইবার তুমি একটু নামো দিকিন খোক আমার কাজ করতে হবে। একেবারে গোলমাল কোরো না, শুনলে যে যুদ্ধুর ঘটাটা? ওরা আবার কাঁদুনে ছেলেদের বেশি করে খুঁজছে, এক কান্নার আওয়াজ পেয়েছে কি ছোঁ মেরে নিয়ে গিয়ে সে—ই একেবা আকাশের ওপর—।...যাও, নামো।"

নিশ্চিন্তে নিরিবিলিতে লেখা লইয়া কয়েক ছত্র অগ্রসর হইয়াছি, আবা ফোঁপানি! ধৈর্য ধরিয়া আছি, ফোঁপানি স্পষ্টতর কান্নায় উঠিল। কলম রুখিয় সংযত স্বরে প্রশ্ন করিলাম, "কি হ'ল আবার?"

কোন উত্তর নাই, কান্নাটা আর এক পর্দা উঠিল মাত্র। আর ধৈ ধরিয়া রাখা যায় না। চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িয়া লেখার খেই হারাইয়া ফেলিয়াছি। অপেক্ষাকৃত অসংযত স্বরেই প্রশ্ন করিলাম, "কি হ'ল শুনি, আবার কান্না কিসের?

"কাকাল ছঙ্গে যুদ্ধু করতে যাবো...।"

গায়ে যেন আগুন ছড়াইয়া দিল; মনে হইল, সমস্ত শরীরটাকে বোমা করিয়া লইয়া এ ছেলের গায়ে ফাটিয়া পড়িতে পারি তো কতকটা রাগ মেটে। শান্তকণ্ঠেই বললাম, "কাকা যুদ্ধু করতে যায় নি, কেরোসিন তেল কিনতে গিয়ে কিউ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।"

কণ্ঠস্বর আরও এক পর্দা উঠিল, "কাকা যুদ্ধু করতে গেছে..."

আর রাগ চাপিতে পারিলাম না, চেয়ারটা একটু সরাইয়া লইয়া ঠাস ঠাস করিয়া কয়েকটা বেশ ওজনদুরস্ত চড় কষাইয়া দিয়া বলিলাম, "ঘরেই যুদ্ধুর সরঞ্জাম আছে, এই দেখ; আর বাইরে যেতে হবে না কষ্ট করে।"

খোকা ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, গলা যা বাহির করিল তাহার তুলনায় পূর্বের কান্না কোথায় পড়িয়া থাকে। মুখে ঐ এক বুলি, "যুদ্ধু যাবো, নড়াই-কল্পা ছেপাই হবো..."

উহার মাতা ছুটিয়া আসিল। বলিল, "পারলে না তো? আমি জানি, তোমার দ্বারা এটুকুও হবে না।"

মেয়েও ছুটিয়া আসিল। তাহার কথাবার্তা তাহার মায়ের মতোই ব্যঙ্গপ্রবণ, শুধু শিক্ষার অভাবে একটু মার্জিত; দরজার নিকট আসিয়া বিস্মিত

কণ্ঠে শান্তভাবে বলিল, "ওগুলো তোমার থাপ্পড় ছিল বাবা? সর্বরক্ষে! আমি ভাবলাম, বোমা ফাটলো বুঝি! সত্যি, এখনও আমার বুক-ধড়ফড় করছে!"

মা ছুটিয়া আসিলেন, তিক্তস্বরে বলিলেন, "তুই দুধের বাছাকে ঐ রকম করে মারলি? কঁকিয়ে গেছে যে!"

বলিলাম, "ও সেপাই হবে, যুদ্ধে যাবে! চুপ না করে তো আরও ঠ্যাঙাবো, হয়েছে কি এখন?"

মা ঝংকার করিয়া উঠিলেন, "যাবে যুদ্ধে, এমন নৃশংস বাপের কাছে থাকার চেয়ে সে লাখো গুণে ভালো। একটা কচি শিশু বায়না ধরেছে, তা..."

খোকা চীৎকার করিয়া চলিয়াছে, "আমি ছেপাই হবো—কাকা গো!..."

মা তুলিতে যাইতেই এমন আছাড়ি-পাছাড়ি খাইয়া পড়িল যে, তিনজনে হয়রান হইয়াও বাগ মানাইতে পারে না। সমস্ত শরীর রাঙা হইয়া উঠিয়াছে; ঘাম, অশ্রুর সঙ্গে মেঝের ধুলা মিশিয়া হালকা কাদায় সর্বাঙ্গ মলিন হইয়া গিয়াছে, এক এক জায়গায় কি করিয়া ছড়িয়া গিয়া রক্তের রেখা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, দারুণ চীৎকারে মুখে ফেনা উঠিতেছে, বুলি—"আমি নড়াই-করা ছেপাই হবো, বোমা কোথায়? কাকা গো!..."

তিনজনে ওদিকে একেবারে নাকানি-চোবানি খাইয়া যাইতেছে। আমি আমার নিজস্ব পদ্ধতিতে ঠাণ্ডা করিবার জন্য দুই-একবার অগ্রসর হইলাম, কিন্তু তিনজনের বূ্যহ ভেদ করিতে অসমর্থ হওয়ায় নিষ্ফল ক্রোধে ওর অনুপস্থিত কাকার উপর ঝাল ঝাড়িতেছি, এমন সময় সে আসিয়া উপস্থিত হইল। এ-আর-পি'র খাকিতে আপাদমস্তক মোড়া, হাতে কাগজে লেপটানো একটা বাণ্ডিল, তাহার মধ্যে, খাকি কাপড়েরই আরও পোশাক-টোশাক কি আছে বলিয়া মনে হইল। ওর চলাফেরা আজকাল সামরিক কায়দায়—সর্বত্র শোভা না পাইলেও বোধ হয় অভ্যাসের দোষে সামলাইতে পারে না। দুয়ারের কাছে জুতার গোড়ালিতে ঠুকিয়া যুক্তপদে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল, ব্যাপারখানা কি?"

ঝংকার করিয়া বলিলাম, "ব্যাপার অনেক! কি সব আজগুবি খেলায় মাথায় সাঁদ করিয়ে বসে আছিস, না শোনে আদর, না মানে ভয়—সেপাই হবো, বোমা কোথায়? নিজে খিদি হয়েছিস, কারুর বারণ না শুনে কোথায়

বোমা ফাটবে, কার ঘর পুড়বে—এই সব নিয়ে রয়েছিস, ওকে সামলায় কে চারটে লোকে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে একটা ছেলের পেছনে।"

মাও আমার সঙ্গে যোগ দিলেন। ওর ভাজ কিছু বলিবার সুবিধা পাই না, তবে ভাইঝি বলিল, কিন্তু তাহার মধ্যে কতটা কাকাকে তিরস্কার আ কতটা আমার অতি-সতর্কতা ও ভীরুতার প্রতি ব্যঙ্গোক্তি তাহা নির্ণয় কর শক্ত। ওর কাকা অবিচলিত এ-আর-পি পদ্ধতিতে খানিকটা শুনিল আমাদের বকুনির জন্য চটিয়াছে, কি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, কি খোকার উপর চাপ রাগে সংযতবাক্‌ হইয়া গিয়াছে কিছু বোঝা গেল না। গটগট করিয়া আসিয়া খোকার সামনে দাঁড়াইল, গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিল, "কাঁদছিস কেন?"

খোকা হঠাৎ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। কাকার গাম্ভীর্য দেখিয়া বা যে কারণেই হউক, ভ্যাবাচাকা খাইয়া গিয়াছে এবং বেশ বোঝা যায়, জোর করিয়া কান্নাটাকে ঠেলিয়া রাখিয়াছে। কাকার প্রশ্নে একবার মুখটা তুলিয়া তাহার পানে চাহিল এবং—"নড়াই-করা ছেপাই হবো, যুদ্ধু..." —বলিতে বলিতে আবার ডুক্‌রাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ওর কাকা সামরিক বা স্টেজের প্রথায় তর্জনীটা উল্টা দিকে বাঁকাইয়া সেই রকম গম্ভীর ভাবেই বলিল, "বেশ, চলে আয়।"

আমরা সবাই থ হইয়া কাকা-ভাইপোর অভিনয় দেখিতেছিলাম। উহারা উপরে উঠিয়া গেলে মা শাসাইলেন, "খবরদার, মারধোর করবি নি বলছি, বড়খোকা। তুই আবার ঐ পাঁশুটে রঙের ছাইভস্ম গায়ে দিয়ে অবধি বড় গোঁয়ার হয়ে পড়েছিস্‌।"

বড়খোকা ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "মারি কাটি যা খুশি হয় করবো। তোমরা আর কথা কয়ো না, চারজন মিলে একটা কচি ছেলেকে এঁটে উঠতে পারলে না! খালি তুলোয় শুইয়ে 'ষেটের বাছা' 'ষষ্ঠীর দাস' করে একেবারে মাটি করতে বসেছ। একটু রক্ত দেখলে, কি একটু আঁচড় লাগলে..."

আমি কতকটা আশঙ্কায় এবং কতকটা লজ্জায় ওরই তরফে হইয়া মাকে বলিলাম, "ঠিক বলেছে, যেমন করে পারুক করুক সায়েস্তা।"

ভাগ্নী কতকটা ভয়ে কতকটা কৌতূহলে পিছু লইয়াছিল, কাকার ধমক খাইয়া থামিয়া গেল।

ভাইপোকে লইয়া বড়খোকা একেবারে তেতলায় ছাদে নিজের ঘরের

দিকে চলিয়া গেল; নিচে হইতে শব্দ লক্ষ্য করিয়া যতটা বোঝা গেল, তাহাতে মনে হইল না, বেশ মোলায়েম ভাবে লইয়া যাইতেছে।

প্রায় আধ ঘণ্টা তিন কোয়ার্টার হইবে। খোকার কান্না নাই, কোন রকমই আওয়াজ নাই। বড়খোকার মেজাজ আজকাল যেমন রুক্ষ হইয়া পড়িয়াছে, খোকাকে কোন অন্তরটিপুনি দিয়া থামাইয়া রাখিল কি না, চিন্তা করিতে করিতে লেখায় কখন অভিনিবিষ্ট হইয়া গিয়াছি,—"ওরে সর্বনাশ করেছে, খুন করেছে ছেলেটাকে হতভাগা!"—বলিয়া মা হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। উপর দিকে চাহিয়া আমিও একেবারে শিহরিয়া উঠিলাম।

খোকার মাথায় এক খামচা টিংচার আয়োডিনে ভেজা মোটা পটি বাঁধা, কপালের ডান দিকের পট্টিটা ভিজাইয়া দিয়া একটু একটু রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে। বাঁ হাতটায় আগাগোড়া একটা পট্টি এবং মণিবন্ধে একটা ফাঁস লাগাইয়া হাতটা গলার সঙ্গে ঝোলানো—ভাঙিয়া গিয়াছে। নাকের ডান দিকটায় একটার উপর আর একটা আড়াআড়ি করিয়া ক্রুশের আকারে স্টিকিং-প্ল্যাস্টার সাঁটা, ডান নাসারন্ধ্র দিয়া রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে। বীভৎস দৃশ্য একটা!

মা ছুটিয়া আসিতেছেন, "ওরে, গুমখুন করেছে ছেলেটাকে হতভাগা, কান্নার আওয়াজও বেরুতে দেয় নি—কি খুনে গোঁয়ার!"

খোকার মাতাও চায়ের সরঞ্জাম ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিতেছে, "ও ঠাকুরপো, ও কি করলে! সাড় নেই যে ছেলের!"

ওদিককার ঘর হইতে উহার ভগ্নীও হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে!

ততক্ষণে প্রথম ভয়ের ঝোঁকটা কাটিয়া গিয়া জখমীর নূতন খাকি শার্ট, খাকি হাফপ্যান্ট আর খাকি মোজার দিকে আমার নজর গিয়াছে; তাহার দাঁড়াইবার নির্বিকার—বরং কতকটা দৃপ্ত ভঙ্গিও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। 'লড়াই-করা ছেপাই'-এর অর্থ বুঝায় মুখে হাসি ফুটিয়াছে আমার।

মা আসিয়া পড়িয়াছেন, ওর নিজের মা ও ভগ্নীও আসিয়াছে।

মার বুঝিতে বোধ হয় একটু দেরি হইল। বুঝিয়াই কিন্তু চেঁচাইয়া উঠিলেন, "খোল্; শীগগির খুলে দে বলছি!...শখ! বাবাঃ, এখনও বুকের ধড়ফড়ানি ঘোচে নি। কাল উলটে গেল একেবারে! খোল বলছি বড়খোকা,

কচ্ছেলের গায়ে অমন বেশ দেখতে নেই চোখে। বাট! বাট! আর ও বোবেটেও দাঁড়িয়ে আছে কেমন দেখ না। সে কান্নাই বা কোথায় গেল!"

উহারা উভয়েই ততক্ষণে বাহিরের দরজার দিকে মুখ করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কাকা প্রশ্ন করিল, "কোন্ হাসপাতালে ভর্তি হবি রে খোকা?"

জখম সেপাই অকম্পিত কণ্ঠে উত্তর করিল, "বলো হাঁচপাতালে।"

দুই জোড়া জুতার দর্পিত মশমশানি বাহিরের রাস্তায় ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

[শনিবারের চিঠি, মাঘ ১৩৪৯]

লেখক

মোহিত আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল,—নিতান্ত ঝড়ের মতো না হোক্, একটা দমকা হাওয়ার মতো তো নিশ্চয়ই। বলিল, "আজ শৈলেনবাবুকে দেখে এলাম!"

মেডিক্যাল্ মেসের ঘর। ছয় জনের সীট্, কিন্তু এখন প্রায় জন দশেক ছেলে গুলতান করিতেছে। মোহিত-প্রদত্ত সংবাদে ঘরটা এককালে নিস্তব্ধ হইয়া গেল। অমর স্টোভে পাম্প্ করিতেছিল, হাত থামাইয়া প্রশ্ন করিল, "কোন্ শৈলেনবাবু? লেখক?"

মোহিতের নিয়ম হইতেছে কোন জবর সংবাদ দিয়া একেবারে গম্ভীর হইয়া যায়, তখন প্রশ্ন করিয়া করিয়া তাহার নিকট হইতে কথা বাহির করিতে হয়। উত্তরও দেয় সাধারণতঃ অল্প কথায়। অমরের প্রশ্নে একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করিতে করিতে বলিল, "ইয়েস্!"

আবার একটু চুপচাপ গেল। মোহিত নির্লিপ্ত ভাবে অমৃতবাজারটা তুলিয়া লইতে শ্যামল ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিল, "কি রকম দেখলেন?"

মোহিত উত্তর দিল না, প্রশ্ন করিল, "কি রকম আন্দাজ হয় আপনার?"

অমর প্রশ্ন করিল, "কি অবস্থায় দেখলেন? মানে কি করছিলেন শৈলেনবাবু?"

"একটা ছোট কাপড় পরে কোমরে গৈতে জড়িয়ে তেল মাখছিলেন।"

পশুপতি এখন পর্যন্ত কোন কথা বলিতে পারে নাই, শুধু প্রতি কথাতেই তাহার চক্ষু দুইটি বিস্ময়ে আরও বিস্ফারিত হইয়া উঠিতেছিল। আর ঔৎসুক্য চাপিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিল, "খালি গায়ে?"

মোহিত ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, "ইয়েস্।"

"কিসের তেল?"

"সরষের।"

অমর স্টোভে পাম্প দেওয়া ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল, চৌকিতে বসিয়া সামনে একটু ঝুঁকিয়া প্রশ্ন করিল, "আমাদের এই সরষের? অর্থাৎ বাজারে যে সরষে পাওয়া যায়?"

প্রমথ দেওয়ালে টাঙানো আর্শির সামনে দাঁড়াইয়া গলায় টাই বাঁধিতেছিল। ঘাড়টা বাঁকাইয়া টাই-পিনটা দাঁতে চাপিয়া একটু বিরক্তির সহিত বলিল, "But, who the devil is he যে, তেল মাখবার সময়ও তার গায়ে একটা ওভারকোট চড়ানো থাকা চাই, আর তার তেলের সরষে হবে something quite different from the stuff we know (আমরা যা জানি তা' থেকে সম্পূর্ণ এক আলাদা জিনিস)? আপনারা যে হাসালেন মশায়,—he is as much a man as any of us!" (যেমন মানুষ আমরা, ঠিক তেমনি মানুষ তো তিনিও!)

এই ছোকরার উপর সকলেই কমবেশি একটু বিরক্ত। কোন জিনিসেরই গাম্ভীর্য এর কাছে নাই। সুট-টাই-হ্যাট্ চড়াইয়া সদাই নিজের চালেই রহিয়াছে, একটা কিছু জমাট কথা পাড়ো, নিজের বাস্তিকতার উত্তাপে তখনই সেটা গলাইয়া পাতলা করিয়া দিবে। কিসের চাল উহার এত? কতগুলা ইংরাজির এঁটো বুকনি ছাড়া জানে কি ও? আর টাইয়ে নিঁখুৎ গেরো দেওয়া ছাড়া বোঝেই বা কি?

অমর বলিল, "মাফ করবেন প্রমথবাবু, তফাৎ একটু হয় বৈকি কখন কখন,—ধরুন, you are as much a Bengalee as any of us, কিন্তু আপনি যে ভাষা ব্যবহার করেন সেটা ঠিক আমাদের গরীব বাংলাদেশের বাজার থেকে কেনা, না, লণ্ডনের ওয়েস্ট্ এণ্ডের কোন অঞ্চল থেকে আমদানি করা?"

প্রমথ চটে না। গলা তুলিয়া টাই-পিনটা আঁটিতে আঁটিতে শান্ত কণ্ঠে বলিল, "No, it's direct from London, place from where your

Bengalee writers get most of their ideas—(না, সোজা লণ্ডন থেকে—তোমাদের বাঙালী লেখকেরা যেখান থেকে তাদের বেশির ভাগ লেখার খোরাক সংগ্রহ করে থাকে।) তা তাঁরা যতই গায়ে সরষের তেল মাখুন না কেন—কোমরে, কানে পৈতে জড়িয়ে।"

মোহিত প্রশ্ন করিল, "ক'টা বাংলা বই পড়ে আপনি এ অভিমতটা দিচ্ছেন, প্রমথবাবু ?"

প্রমথ আলনার খুঁটি থেকে টুপিটা নামাইয়া লইল, তাহার পর ঘুরিয়া সিধা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "None, and I congratulate myself !—(একটিও পড়িনি, আর সেইটুকুই আমার গৌরব !)"

তাহার পর সাহেবী কায়দায় টুপিটা একটু চালনা করিয়া, "So long !" বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

পশুপতি বলিল, "চাল্লুস্ কোথাকার !"

কিন্তু রসভঙ্গ হইল। আবার যে কোন্ দিক দিয়া কি ভাবে লেখক শৈলেনবাবুর অলৌকিক আড়ম্বরহীনতার কথাটা উত্থাপন করিবে কেহই ভাবিয়া পাইতেছিল না। মোহিতও চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু সেটা যে গাম্ভীর্যের মৌনতা নয়, সেটা সকলেই মনে মনে বুঝিতেছিল। ঘরটা শৈলেনবাবুর দেশী ভাবে বেশ জমাট হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু এখন যেন প্রমথর ক্রূর ব্যঙ্গে গম্‌গম্ করিতেছে। সকলেই আক্রোশে ফুলিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ গেল। নীতীন বলিল, "আমার মাথায় এক প্ল্যান্ এসেছে—ওর উপযুক্ত জবাবও হয়।"

দুই তিন জনে প্রশ্ন করিল, "কি প্ল্যান্ ?"

"শৈলেনবাবুকে অভিনন্দিত করি আসুন সবাই…যে সাহিত্যকে ও হেয়জ্ঞান করছে, ওর নাকের ওপরই সেই বাংলাসাহিত্যের জয়-জয়কার করা হবে।"

সকলেই আগ্রহের সহিত প্রস্তাবটা লুফিয়া লইল। পশুপতি বলিল, "ঠিক, শুধু সাহিত্য নয়—আমাদের দেশী বাঙালী ভাবটা যে কি—উচ্চ চিন্তার সঙ্গে সিম্প্লিসিটির (অনাড়ম্বরতার) কি অদ্ভুত সমন্বয়, ও চালবাজ একবার দেখুক। আমাদের ব্যারাকপুরে একবার উদীয়মান নাট্যকার পরেশবাবুকে অভিনন্দিত করা হয়েছিল—কি সিম্প্‌ল্ !—গাড়ি থেকে নামলেন কাছার একটা খুঁটই ভালো করে গোঁজা নেই !—তিনজন একসঙ্গে নাবলেন, চেনবারই

জো নেই, কে সাহিত্যিক, কে সাহিত্যিক নয়!…ও চালবাজ ভেবেছে কি?… ঈস্, ভা-রী আমার!…"



'সো লং!…'

হাওয়াটা আবার কতকটা বদলাইল।

অময় আবার প্রশ্ন করিল, "আপনি নিজের চোখে দেখলেন নিজের হাতে তেল মাখছেন?…মাখবার কোন বিশেষ ভঙ্গি লক্ষ্য করলেন না? আর্টিস্টিক্ কিছু একটা?—যেমন, বলুন…"

সতু একটা নভেল পড়িতেছিল, আঙুলের উপর বইটা মুড়িয়া বলিল,

অভিনন্দন তো দিতে চাইছেন আপনারা, তিনি কি রাজি হবেন?—ছুটি আছে তাঁর?"

সকলে উৎসুকভাবে মোহিতের মুখের পানে চাহিল। মোহিত চিন্তিত-ভাবে খানিকটা মৌন রহিল, তাহার পর ভ্রূযুগল উঠাইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "হওয়া তো উচিত। যে রকম দেখলাম তাতে তো তাঁকে আমাদেরই একজন বলে ভাবতে সাহস হয়। এ্যাপ্রোচ্ করতে, কি রাজি হওয়াতে কোন বেগ পেতে হবে না বলেই তো ভরসা করি।"

নীতীন উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "নাঃ, তোল চাঁদা; আমি দু'টাকা।"

পশুপতি একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, শুনিয়া যেন তাহার আর আশা মিটিতেছিল না; নিজের সীট থেকে উঠিয়া আসিয়া মোহিতের পাশে বসিয়া প্রশ্ন করিল, "ভয়ংকর সিম্প্ল্, বুঝি?"

মোহিত বলিল, "বোধ হয় পাঁচ ছ' দিন দাড়ি পর্যন্ত কামান নি—দেখে যেমন বুঝলাম।"

পশুপতি একবার সকলের দিকে বিপুল বিস্ময় এবং প্রশংসার দৃষ্টিতে চাহিল, তাহার পর আবার মোহিতের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গোঁফ রাখেন, না ফেলে দিয়েছেন?

মোহিত বলিল, "রাখেন।"

লেখক গোঁফ রাখেন। এ যুগে থাকিয়াও!...পশুপতির আর বাক্যস্ফূর্তি হইল না। এ যে সিম্প্লিসিটির চরম হইল!

কয়েকজন একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "পুরো গোঁফ?...মুখের এক কোণ থেকে অন্য কোণ পর্যন্ত?...সেকেলের ধরণের?"

মোহিত বলিল, "ইয়েস্।"

শ্যামল বলিল, "ভুল দেখেন নি তো আপনি?"

মোহিত একটু অসহিষ্ণুভাবে বলিল—"আজ্ঞে না, ভুলও দেখিনি, দেখেও ভুল করবার জো নেই। আপনাদের নরুণের মতো মিহি বাটারফ্লাই গোঁফ নয়তো,—বোল্ড, রীতিমত ওজন আছে। দেখবেনই আজ বাদে কাল।"

তাহাই ঠিক হইল। চক্ষুকর্ণের বিবাদও মিটুক, ওদিকে প্রমথটাকেও উপযুক্ত থাপ্পড় দেওয়া হোক্।

শৈলেনবাবু রাজি হইয়াছেন। মোহিত আসিয়া রিপোর্ট দিল,—"ঠিক ছ'টায় সময় আসবেন বললেন। আর বেশিক্ষণ থাকতে পারবেন না।"

পশুপতি উৎসুকভাবে প্রশ্ন করিল, "কেন ?"

মোহিত তাহার পানে একটু আড়চোখে চাহিয়া বলিল, "তাঁর সময়ের দাম আছে।"

প্রমথ ছিল, বলিল, "Rubbish, that's style—pure and simple! (ছাই, এটা চালবাজি ছাড়া কিছু নয়)।"

মোহিত প্রমথর পানে আড়চোখে চাহিল মাত্র, দারুণ অশ্রদ্ধায় তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না।

শৈলেনবাবুর অভিনন্দনের আয়োজন চলিতে লাগিল। একেবারে ভারতীয় প্রথায় অভিনন্দন করিতে হইবে। ঘরে চেয়ার-টেবিলের নামগন্ধ থাকিবে না। চৌকিগুলি একত্র করিয়া তাহার উপর সতরঞ্চি আর জাজিম বিছাইয়া দেওয়া হইবে। তাহার মাঝখানটিতে একটি গদি থাকিবে,—দুই পাশে এবং পিছনে তাকিয়া। অভিনন্দনকারীদের পোষাক হইবে ধুতি, পাঞ্জাবি এবং চাদর। অমর প্রভৃতির ইচ্ছা ছিল তাহাদেরই ঘরে আয়োজন হয়, প্রমথ কিন্তু আলনা হইতে তাহার কোট-প্যাণ্ট-টুপি প্রভৃতি সরাইতে রাজি হইল না; অধিকন্তু এটা জানাইয়া দিল যে, মিস্টারের নিকট যে ইংরাজী গানটা শিখিতেছে সন্ধ্যার সময় সেইটা লইয়া একটু গলা ভাঁজিবে।

এই ঘরটা একটু বড় ছিল, বাধ্য হইয়া, গান না পৌঁছায় এরূপ তফাতে একটি চার-সীটের অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরই বাছিয়া লইতে হইল।

সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। উপযুক্তরূপে ঘর সাজাইয়া এবং নিজেরাও ধুতি চাদরে সাজিয়া সবাই অপেক্ষা করিতেছে। মোহিত নাই, সে শৈলেনবাবুকে সঙ্গে করিয়া আনিতে গিয়াছে। নীতীন উদ্বোধন গীত গাহিবে। সকলে মিলিয়া চাঁদা করিয়া একটি গান রচনা করিয়াছে, "ঘন তমসাবৃত"-এর সুর। প্রথম দুইটা লাইন—"শুভ্র—বসন—পরা—চন্দন কপালে, মর্তে বাণীবরপুত্র হে কে এলে"। নীতীন ফরাসের উপর হারমোনিয়ামটা লইয়া মিহি গলায় গানটা সাধিতেছে, এমন সময় একটা ট্যাক্সি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কালো রঙের সুট, কালো টাই, কালো জুতা ও ফেল্ট-হ্যাট-পরা একটি ভদ্রলোককে লইয়া মোহিত নামিল। কি একটা গভীর নিরাশায় যেন তাহার মুখটা একেবারে পাংশুটে হইয়া গিয়াছে। দৃষ্টি আনত। ভদ্রলোক ট্যাক্সিতে ফেল্ট্-হ্যাটটা ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, ফিরিয়া দুইপা আগাইয়া আনিতে

গেছেন, কয়েকজনে মোহিতের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল, "এলেন না?"

পশুপতি জিজ্ঞাসা করিল, "সময় হ'ল না বুঝি?"—এমনভাবে প্রশ্নটা করিল যে বেশ বোঝা গেল—সময়ের অভাবেই যদি শৈলেনবাবু আসিতে না পারিয়া থাকেন তো সে মোটেই দুঃখিত নয়।

মোহিত চক্ষু দুইটা ভূমি হইতে উঠাইয়া আচ্ছন্নভাবে বলিল, "এসেছেন তো; এই যে···আসুন, চলুন ওপরে!"

মুহূর্তের মধ্যেই মোহিতের মুখের পাণ্ডুরতাটা সংক্রামক ব্যাধির মতো সবার মুখে ছাইয়া গেল। সবাই একবার পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল, তাহার পর দুইদিকে সরিয়া দাঁড়াইয়া মোহিত আর সাহেববেশী শৈলেন-বাবুর জন্ম রাস্তা করিয়া দিল।

০ . ০ ০ ০

সে রাত্রে আহারের সময় ব্যাপারটা লইয়া আলোচনা হইল একটু।

অমর বলিল, "নাঃ, বড়ই নিরাশ করলে ভদ্রলোক, একেবারে সাহেবী পোষাক!...কি মোহিতবাবু?"

প্রমথ বলিল, "অন্ দি কন্‌ট্রারি, তোমরাই তাঁকে বড় নিরাশ করেছ—মেডিকেল কলেজের মতো জায়গায় একটা ভালো social function-এ যোগদান করতে আসছেন বলে ভদ্রলোক ভদ্রোচিত পোষাক-টোষাক পরে এলেন,—তোমরা তাঁকে টেনে তুললে যেন কণ্বমুনির আশ্রমে—[illegible] কলসি, কলাগাছ, দোরে আমপাতার মালা টাঙানো, তার ওপর আপাদমস্তক শাদায় মুড়ি দিয়ে এক একটা শাদা বকের মতো তোমরা সবাই ঘুরে বেড়াচ্ছ···it must have been a rude shock for the poor man...(বেচারার খুবই চোট খেতে হয়েছে।)···টুপীর নিচে চন্দনের কৌটা দিয়ে দাও নি তো? That would have been the climax!" (সেটা একেবারে চরম হ'ত!)

কথাটা কেহ গায়ে মাখিল না, অর্থাৎ বাহ্যতঃ নীরব রহিল, যদিও অন্তরে সকলেই দগ্ধ হইতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে নীতীন বলিল, "আমি একটা কারণ ঠাউরেছি—আর তা যদি মিথ্যে না হয় তো কি বলেছি।—মোহিতবাবু নেহাৎ ময়লা ছোট কাপড় পরে তেল মাখতে দেখে ফেলেছিলেন বলেই বোধ হয় উনি একেবারে ইভনিং স্যুট পরে এসে হাজির হলেন!"

সকলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিল। নীতীন পানটা নষ্ট হওয়ায় চটিয়াও ছিল সব চেয়ে বেশি, বলিল, "ভাবলেন—নেহাৎ তেল-জোবড়ানো হেঁজিপেঁজি লেখক এরা না মনে করে আমায়···দেখুক, আমি লোকটা কে!..."

অমর বলিল, "সে ছিল আটপৌরে লেখক, এ হ'ল পোষাকী"

পশুপতি বলিল, "তাই বটে।"

কেহ এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের প্রতিবাদ করিল না; দু'একজন কুটিল হাস্য করিল, বাকি সবাই চুপ করিয়া রহিল।

অর্থাৎ নীতিন, অমর, পশুপতির অভিমতটা তাহারা সমর্থন করিল। এবং দারুণ নিরাশার মধ্যে এইটুকুতে যা সান্ত্বনা পাওয়া গেল তাহাই সম্বল করিয়া সকলে একে একে শয্যা গ্রহণ করিল।

[সাহানা—]

ভক্ত

জায়গাটা কলিকাতা হইতে বেশি দূরে নয়, যাহাদের মোটর আছে এবং সন্ধ্যার দিকে একটু বাহিরের হাওয়া খাইয়া আসিবার শখ আছে, গিয়া ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পারেন। অনে.ক যায়; অবশ্য জায়গাটায় যে কোন বিশেষ আকর্ষণ আছে এমন নয়, তবে পথটায় একটা মোহ আছে নিশ্চয়,—অন্ততঃ মুগ্ধ হইতে জানে এমন দৃষ্টির কাছে। প্রশস্ত পিচ-ঢালা পথ, কলিকাতার রুক্ষতা এড়াইয়া ক্রমশই গাঢ়তর সবুজের মধ্য দিয়া দক্ষিণে নীল চক্রবালের দিকে চলিয়া গিয়াছে—ছায়াচ্ছন্ন পল্লী, প্রশস্ত মাঠ, চায়ভূমি; আবার পল্লী, মাঠ, বাগান—ক্রমে এই জায়গাটা আসিয়া পড়ে, খুব সমৃদ্ধ একটা বড় গ্রাম। অনেকগুলি ক্ষুদ্রতর গ্রামের সমাবেশ বলিলেও চলে; বাড়ি, বাগান, দেউল, পাঠশালা, ইস্কুল, জনসমাকীর্ণ বাজার। চারিদিকটা ম্যালেরিয়াবিধ্বস্ত, হতশ্রী; তাহারই মধ্যে পুরাতন বাংলার নমুনা হিসাবে যেন বিধাতা এই স্থানটুকু বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। একটু ঢিলাঢালাভাবে বলিতে গেলে এটা যেন তাঁহার পুরাতত্ত্ব-বিভাগের একটা নিদর্শন; ঢিলাঢালাভাবে

এই জন্য বলিতেছি যে, এটা নবীনের মাঝে ধ্বংসস্তূপ নয়, ধ্বংসের মাঝে কালজয়ী নবীনের প্রতীক।

গ্রামটির নাম রাজগ্রাম।

এই রাজগ্রামে একদিন অপরাহ্ণে একটি বেশ মাঝারি সাইজের সীডান-বডি মোটর-কার আসিয়া বড় রাস্তার ধারে একটি গাছের নিচে দাঁড়াইল। ধারেই একটি ছোট বাংলো-গোছের বাড়ি, সঙ্গে লোহার রেলিং দিয়া ঘেরা একটি পরিচ্ছন্ন বাগান। মোটরের কি একটা অংশ সাময়িকভাবে বিকল হইয়াছে, একটু ঠিক করিয়া লওয়া দরকার। মোটরে দুইজন আরোহী; খুব ব্যাকরণদুরস্ত করিয়া বলিতে গেলে—একজন আরোহী, একজন আরোহিণী। আরোহী আস্তিন গুটাইয়া মোটরের তদারকে লাগিয়া গিয়াছেন, আরোহিণী মাঝপথে বাহনের এরূপ ব্যবহার দেখিয়া কতকটা নিরুৎসাহভাবে সামনের আসনে বসিয়া আছেন।

রাস্তার অপর দিকে খানিকটা প্রশস্ত খালি জায়গার পর একটি বেশ বড়-গোছের পুকুর। বেশ একটি ভালো করিয়া বাঁধানো ঘাট, ঘাটের মাথায় দুই দিকে দুইটি শানের বেঞ্চ। একটি বেঞ্চে তিনজন ছেলে বসিয়া আছে—অতুল, ধীরেন আর পরিমল। ইহারা স্থানীয় স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্র। আজ স্কুলে সন্ধ্যার সময় একটা মীটিং আছে, সরস্বতীপূজার কমিটী গঠন হইবে। ভোট ইত্যাদি লইয়া যে কূটচাল চলিতেছে তাঁহা লইয়া, সেই সঙ্গে পাশের দুই-তিনটি গ্রামের স্কুলে যে পূজা হইবে সেগুলার সহিত টেক্কা দেওয়া লইয়া আলোচনা চলিতেছে। এই পথে দলের আরও কয়েকজন জুটিবে, তাহার পর সকলে স্কুলাভিমুখী হইবে। অতুল ছেলেটি ইহাদের মধ্যে একটু মাতব্বর-গোছের। বছর সতেরো-আঠারো বয়স হইবে, বইয়ে মুখ গুঁজিয়াই পড়িয়া থাকে না, আরও পাঁচটা ভালোমন্দ জিনিসের খোঁজখবর রাখে।

মোটরটা আসিয়া এই দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইল। আরোহী মেরামতে নামিলেন, আরোহিণী করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া রাস্তার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন,—একেবারে বিমুখ হইয়া নয়, আধখানা অর্থাৎ কপাল, নাসিকা, ওষ্ঠাধর ও চিবুকের রেখাটা দেখা যায়।

অতুল যেখানে বসিয়া থাকে সেইখানটুকুতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখে না; একটু পরে হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "তোরা বোস্, এলাম বলে।"

উঠিয়া কোঁচাটা একটু ঝাড়িয়া জামাটা ঠিক করিয়া নিতান্ত নিরুদ্দেশ্যভাবে

মোটরখানার পাশ দিয়া হনহন করিয়া চলিয়া গেল। অনেকটা দূর গিয়া একটা মোড় পড়ে, সেটার ওদিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। খানিকটা পরে তেমনই নির্লিপ্ত গতিতে মোটরের পাশ দিয়া শানের বেঞ্চটিতে আসিয়া বসিল। ঠিক সে অতুল নয়, নিশ্বাস ঘন ঘন, সমস্ত মুখটি খানিক রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, আর নীরব। একটা কিছু ব্যাপার হইয়াছেই।

ধীরেন প্রশ্ন করিল, "হঠাৎ অমন করে গেলি আর চলে এলি ?"

অতুল একবার 'উঁ' বলিয়া ঘাড়টা বাঁকাইয়া দাঁতে নখ খুঁটিতে লাগিল, ভয়ানক অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে।

মোটর হইতেই এই ভাবান্তরের উদ্ভব, যতদূর মনে হয় মোটরের আরোহিণী লইয়া,—সঙ্গী দুইজনে গভীর অভিনিবেশের সহিত এবং যতটা সম্ভব ভদ্রতা রক্ষা করিয়া আড়চোখে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। শেষ পর্যন্ত কিন্তু কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পরিমল একটু অসহিষ্ণুভাবেই বলিল, "ব্যাপারখানা কি রে ? তোর যে বাক্‌রোধ হয়ে গেল।"

অতুল কথা কহিল, বলিল, "আগে তাড়াতাড়ি দেখে আয়, মোটর সেরে নিয়ে চলে গেলে চিরকাল আপ্‌সে মরবি।"

পরিমল বলিল, "দুজনেই যাবো ?"

অতুল মন্তব্য করিল, "বাঃ, পাব্লিক্ রোড্, দুজন ছেড়ে আমরা যদি চারজন জোট বেঁধে যাই, কার কি বলবার আছে ?"

পরিমল আর ধীরেন মস্তবড় প্রয়োজনের তাগিদে ক্ষিপ্রপদে মোটরের পাশ দিয়া অতুলের মতো চলিয়া গিয়া রাস্তার মোড়ের ওদিক হইতে ফিরিয়া আসিল। যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া যাওয়া, এদের যাইবার সময় তিনি মুখটা আরও একটু বাঁকাইয়া লইয়াছিলেন, ফিরিবার সময় ইহারাই সাহস করিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিতে পারিল না।

বসিতে বসিতে ধীরেন বলিল, "হ'ল না, ঘাড়টা একেবারে বেঁকিয়ে বসলো ; কে বল্ দিকিন ?"

অতুল বলিল, "তোরা একেবারে অপদার্থ ; আমি তো ওঁর ঘাড় বাঁকাবার কায়দা থেকেই ধরে ফেললাম, ওইটে ওঁর ফেবারিট্ পোজ্।"

পরিমল বলিল, "হেঁয়ালি রেখে কে বল্ মাইরি, আর একবার না হয় চেষ্টা করি তা হ'লে।"

অতুল কণ্ঠে যতটা সম্ভব সংযত গাম্ভীর্য আনিয়া বলিল, "বনলতা দেবী।"

পরিমল বিস্ময়ে একেবারে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল, বলিল, "বনলতা —বিয়ন্টার ! তিনি রাজগাঁয়ের মতো জায়গায় কি করতে আসবেন? রাজ-গাঁয়ের এত সৌভাগ্য…"

ধীরেনের বিস্ময় এত বেশি যে, বাক্যস্ফূর্তিই হইল না।

অতুল মোটরের দিকে একটা চক্ষু রাখিয়া একটু চাপা গলায় ধমক দিয়া বলিল, "বোস্, দেখছেন এদিকে। তোরা যেন আদেখলে হয়ে পড়েছিস্!"

মোটরে আর ঘাটে বেশ খানিকটা তফাৎ হইলেও মাঝখানে কিছুর অন্তরাল নাই। পরিমল মুখটা ঘুরাইয়া দেখিল, আরোহিণী তখনও ঠিক এদিকে চাহিয়া না থাকিলেও, এমনভাবে আছেন যাহাতে তীর্যক দৃষ্টিতে ফল পাওয়া যায়। একটু অপ্রতিভভাবে বসিতে বসিতে বলিল, "তুই সিওর্ জানিস—বনলতা ?"

ধীরেনের এতক্ষণে যেন সংবিৎ হইল, বলিল, "একটা অভিনন্দনের ব্যবস্থা করলে হয় না ?"

কথার উপর কথা পড়ায় পরিমল খিঁচাইয়া বলিল, "দেখছিস্ একটা বিপদে পড়েছেন উনি,—অভিনন্দন !"

অতুল চিন্তা করিতেছিল, বলিল, "সাহস আছে ?"

দুইজনে মুখের পানে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিল, অতুল বলিল, "তা হ'লে মেয়েলী লজ্জা ছেড়ে একটু এগিয়ে যেতে হয়, ওঁদের সাহায্য দরকার।"

পরিমল উঠিতে উঠিতে বলিল, "রাজগাঁয়ের দুর্ভাগ্য—এত দেশ থাকতে এখানে এসেই ওঁদের মোটর বিগড়ে গেল।—তুই সিওর্—উনি বনলতা দেবী ?"

মেয়েলী লজ্জাটা সম্পূর্ণ পরিহার করা গেল না ; একটু কুণ্ঠিত চরণে ইহারা আসিয়া রাস্তার ধারে দাঁড়াইল। তিনজনেরই মুখ রাঙা হইয়া গিয়াছে। ভদ্রলোক মোটরের ওপাশে ঝুঁকিয়া একটা যন্ত্র হাতে লইয়া কি তদারক করিতেছেন, আরোহিণী ইহাদের একবার চকিতে দেখিয়া লইয়াই মুখ ফিরাইয়াছিলেন, বোধ হয় কোন রকম অস্বস্তি বোধ হওয়ায় ধীরে ধীরে ফিরিয়া বসিলেন এবং অতুল ও অতুলের দেখাদেখি অপর দুইজনেও অভিবাদন করিতে হাত তুলায় প্রত্যভিবাদন করিলেন। একটু চুপচাপ গেল, তাহারই মধ্যে

ধীরেন ফিসফিস করিয়া বলিল, "ঠিক সেই রকম স্টাইলের দরকার! কি যেটা রে অতুল? মনে আসছে না।"

আরোহিণী প্রশ্ন করিলেন, "আপনাদের এখানেই বাড়ি?"

তিনটি কণ্ঠেই একসঙ্গে ত্রস্ত উত্তর হইল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" অতুল সেই সঙ্গে প্রতি-প্রশ্নও করিল, "আপনাদের কোন সাহায্যের দরকার আছে?"

আরোহিণী একটু হাসিয়া বলিলেন, "ওঁকে জিজ্ঞেস করুন, আমি তো দিব্যি রাণীর হালে বসে আছি।"

নিজেই আরম্ভ করিলেন, "শুনছো? এঁরা বলছেন…"

ভদ্রলোক উঠিয়া দাঁড়াইলেন, প্যাণ্ট আর শার্ট পরা, হাতের আস্তিন গোটানো, দুই-এক জায়গায় তেল-কালি লাগিয়া গিয়াছে। মাঝবয়সী লোকটি, একটু বিপর্যস্ত হইলেও মোটামুটি মুখটা বেশ প্রসন্ন। হাসিয়া বলিলেন, "শুনেছি।" তাহার পর ইহাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সাহায্য তো রাণীরই দরকার, কি বলো? তোমরা স্কুলে পড়ো?"

ত্রিকণ্ঠে উত্তর হইল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তা হ'লে তো কুইন-বী অর্থাৎ মক্ষীরাণীর ইতিহাস…"

আরোহিণী ক্রোধের অভিনয় করিয়া বলিলেন, "কি হচ্ছে ছেলেমানুষদের সঙ্গে?"

ভদ্রলোক বলিলেন, "না না, আমায় সাহায্য করলেও সাহায্যটা আসলে বর্তাবে কোথায় তাই বলছিলাম।…আছে দরকার সাহায্যের, কাছে-পিঠে কোথাও মোটরের কারখানা আছে?"

অতুল আগ্রহ সহকারে প্রশ্ন করিল, "ঠেলে নিয়ে যেতে হবে?"

ভদ্রলোক সেই জাতীয় রসিক মানুষ, যাহারা বিদ্রূপের সুবিধা হইলে ছেলে, বুড়া, সমবয়সী কাহাকেও বাদ দেয় না, হাসিয়া বলিলেন, "না, মিস্ত্রিকে ডেকে আনলেই হবে। যদিও ঠেলে নিয়ে যেতে না পারায় তোমরা বোধ হয় একটু নিরাশ হবে।"

এরা তিনজনে একটু লজ্জিত হইল, আরোহিণীর কণ্ঠে একটু আপত্তিসূচক শব্দ উঠিল, "আঃ!"

পরিমল অতুলের দিকে চাহিয়া বলিল, "কারখানা তো সেই যার নাম তিন মাইল এখান থেকে, তার চেয়ে মজিদদার কাছে যাবো? যদি উনি

শফারটাকে ছেড়ে দেন, ওঁর যন্ত্রপাতি সবই আছে।...কতক্ষণ লাগবে, সারতে মনে হয় আপনার?"

ভদ্রলোক বলিলেন, "তা যে রকম বিগড়েছে ঘণ্টা তিনেক লাগবে; শফার যদি এক্স্‌পার্ট হয় তো..."

আরোহিণী ভীতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "তিন ঘণ্টা! তিন ঘণ্টা এই রাস্তায় মাঝে বসে থাকতে হবে?"

ভদ্রলোক বলিলেন, "আর একটা উপায় আছে।"

"কি? তাই করো।"

"সেটা হচ্ছে ভাঙা মোটরটাকে বালিগঞ্জে ঠেলে নিয়ে যাওয়া। ওরা তো তোয়ের রয়েছেই।"

সঙ্গিনী আবার রাগিয়া উঠিলেন, "এই বিপদের মধ্যেও তোমার তামাসা করতে যায় ইচ্ছে?"

উত্তর হইল, "মোটর বিগড়েছে; সঙ্গে সঙ্গে সারাবার উপায় হয়েছে, এটাকে যদি বিপদ বলো, তো সারাবার উপায় না-হওয়াটাকে কি বলতে?"

সঙ্গিনী অধিকতর ক্রোধে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন। এদের তিনজনের মধ্যে ফিসফিস করিয়া কি পরামর্শ হইল; অতুল গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইল; সে এমনিই একটু বেশ চনমনে, একটু সংকোচ যা ছিল, সহজ কথাবার্তায় সেটা কাটিয়া গিয়াছে, বলিল, "আজ্ঞে, রাজগাঁয়ে এসে যদি আপনাদের মতো দেশের গৌরবকেও রাস্তায় বসে থাকতে হয় তো রাজগাঁ কি আর লজ্জায় মাথা তুলতে পারবে? সে ব্যবস্থাও আমরা করছি।"

আবার তিনজনে কি পরামর্শ হইল, পরিমল আর ধীরেন দুইজনে দুই দিকে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল, অতুল উপস্থিত রহিল।

এদিক ওদিক পাঁচরকম গল্পে খানিকটা অতীত হইয়াছে; দেখা গেল, ছোট বড় দলে চারিদিক হইতে ছেলেদের দল মোটর লক্ষ্য করিয়া চলিয়া আসিতেছে, যতই আগে আসিতেছে গতি ততই শ্লথ হইয়া পড়িতেছে; মিনিট কুড়ি-পঁচিশেকের মধ্যে বিভিন্ন পথে প্রায় জন ত্রিশেক ছেলে আসিয়া অতুলের পিছনে জড়ো হইয়া গেল, আরও আসিতে লাগিল। সকলে যেন হাঁপানি চাপিবার চেষ্টা করিয়া হাঁপাইতেছে, বেশ বোঝা যায়, প্রথম দিকটা ইহারা ছুট দিয়াই আসিয়াছে। ছাত্রই, আশেপাশে কিছু কিছু কৌতূহলী ইতর-সাধারণও আসিয়া জুটিল।

সমস্ত জায়গাটি চাপা কৌতূহলপূর্ণ প্রশ্নে, নানারকম মন্তব্যে, একটু কথোক বাদপ্রতিবাদে গুঞ্জরিত হইয়া উঠিল। অতুলের প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে; সে পুরাদমে ভদ্রলোকটির সঙ্গে গল্প করিয়া যাইতেছে, আরোহিণী মাছে মাঝে কিছু বলিলে সেদিকেও খেয়াল রাখিতেছে, উত্তর বা অভিমত যেটি দরকার চালাইয়া যাইতেছে, অবসরমত সঙ্গীদেরও এক-আধটা চাপা প্রশ্নের চাপা উত্তর দিতেছে, এক-একবার দুই পা পিছাইয়া গিয়া গুঞ্জনকারী-দের মৃদু ধমক দিতেছে, "একটু চুপ কর্, তোরা ডোবালি গ্রামের নাম; কি আইডিয়া নিয়ে যাবেন বল্ দিকিন?"

এখানে-ওখানে অনেকগুলি পকেট হইতে নানা ছাঁদের অটোগ্রাফ-বুক আত্মপ্রকাশ করিবার প্রয়াস করিতেছে। "অতুলদা!...ভাই অতুল!...অতুল ভাই, কিচ্ছু না হোক্, শুধু নামটা, নিজের হাতে..."

অতুল চোখ আর হাতের খুব সূক্ষ্ম ইশারা করিয়া চাপা গলায় বলিতেছে, "হচ্ছে ব্যবস্থা, সবুর; কি যে আদেখলে সব!"

পরিমল আসিয়া উপস্থিত হইল, যেন একটা দেশ জয় করিয়া ফিরিতেছে। সঙ্গে একজন শফার, হাতে গোটা দুই যন্ত্র, তাহার পিছনে যন্ত্রপাতির বাক্স লইয়া একটা কুলি-গোছের লোক।

বলিল, "মলিনদা ভয়ংকর দুঃখিত, তিনি নিজে আসতে পারলেন না, তাঁর ১০২ ডিগ্রী জ্বর, আর কোমরে অসহ্য বেদনা।"

নিজের কোমরটা অল্প একটু বাঁকাইয়া মুখটা কুঞ্চিত করিল।

"তবু মোটরে আসতেন, একটা মস্তবড় সৌভাগ্য কিনা—গাঁয়ের সৌভাগ্য —কিন্তু মোটর দুদিন থেকে, ভেঙে পড়ে রয়েছে। এত দুঃখু করছেন, বোধ হয় আরও দু' ডিগ্রী জ্বর উঠে গেছে। বললেন, মোটর ঠিক হয়ে গেলে একবার নিশ্চয় ওঁর ওখান হয়ে যাওয়া চাই। ডাক্তার তালুকদারও ছিলেন, আসবার সময় আমায় একপাশে ডেকে বললেন, 'ওঁদের নিশ্চয় নিয়ে এসো, হার্টটা দুর্বল যাচ্ছে, ডিস্অ্যাপয়েন্ট্‌মেন্ট্ হ'লে টপ করে কোল্যাপ্স্ করে যেতে পারে।'...নাও হে, তুমি লেগে যাও।"

শফার যন্ত্রপাতি বাহির করিতে লাগিয়া গেল।

ভদ্রলোক বলিলেন, "সে কি, তিনি এতটা ব্যবস্থা করলেন, আর আমরা দেখা না করে কখনও চলে যেতে পারি? তিনি এখানকার কে? জমিদার?"

অতুল পরিমলের পানে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "কে নন এখানকার তিনি?—পাইক্ অ্যাণ্ড পোল!"



'যতীন, রমেশ, কেষ্ট, মদন, হরকালী...'

বীরেন আসিল,—মুখ নিচু, গম্ভীর, ত্রস্ত; একটু এদিক-ওদিক হইলেই যেন একটা গোটা রাজ্য হাতছাড়া হইয়া যাইবে। সঙ্গে একজন মালী। কাহাকেও কিছু না বলিয়া, কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সোজা বাড়িটার

দিকে গিয়া গেট খুলাইল, খটখট করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া রকে উঠিয়া সামনের দুয়ার খুলাইল, মালীটাকে সঙ্গে করিয়া ভিতরে অদৃশ্য হইয়া গেল, খটখট ঝটপট দুয়ার-জানালা খুলিবার আওয়াজ শুরু করাইয়া দিয়া, মিনিট দুয়েকের মধ্যে আবার বাহিরে রকে আসিয়া ভিড়ের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইল এবং আধ মিনিটটাক চোখ বুলাইয়া নাটকীয় পদ্ধতিতে আঙুল উল্টাইয়া ইঙ্গিত করিল, "যতীন, রমেশ, কেষ্ট, মদন, হরকালী!"

দলের মধ্যে হইতে নামকরা পাঁচজন ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া সামনে মাথা ঝুঁকাইয়া আধা-দৌড়ের চালে জুতা ঘষিতে ঘষিতে উপরে উঠিয়া গেল। আরও কয়েকজন অনুগমন করিতেছিল, অতুল কথাবার্তার মধ্যেই ইংরেজীতে বলিল, "নট নাউ!" তাহারা একটু অপ্রতিভ হইয়া দাঁতে নখ খুঁটিতে খুঁটিতে, কি কোমরে কোঁচা গুঁজিতে গুঁজিতে ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন করিল।

মিনিট দুয়েকও হইবে না, ধীরেন আবার বাহিরের রকে আসিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "রেডি। এবার ওঁদের নিয়ে আসতে পারো, অতুল।"

দুইজনকে লইয়া অতুল বাংলোটাতে প্রবেশ করিল; 'নট-নাউ'এর রেশটি তখনও বাতাসে রুনরুন্ করিতেছিল। কিছু গেটের বাহিরে কিছু গেটের ভিতরে, যাহাদের সাহসটা আর একটু বেশি অথবা কৌতূহল-প্রবৃত্তিটা বেশি অনমনীয় তাহারা রকের উপর পর্যন্ত উঠিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। অতুল একবার বাহিরে আসিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, "ভাই, উনি একটু হাত-পা ধুয়ে জিরিয়ে নিন, তারপর তোমাদের কিছু প্রশ্ন থাকে, কি কিছু বাণী নেবার থাকে, কি শুধু অটোগ্রাফ-বুক থাকে—সব ব্যবস্থা হবে। তোমাদের মনের অবস্থা বুঝছি, কিন্তু একটু ধৈর্য ধরতেই হবে।"

এই দশ মিনিটের মধ্যে অব্যবহৃত বাড়িটা ধীরেনের দল এমন করিয়া তুলিয়াছে যে, মনে হয়, বাড়ির লোকেরা এইমাত্র যেন বাহিরে একটু বেড়াইয়া আসিতে গিয়াছে। চেয়ার-টেবিল ঝকঝকে তকতকে, দুয়ার-জানালায় ধূলির চিহ্নমাত্র নাই, ফুলদানিতে ফুল, ওদিকে কুয়া হইতে জল তুলিয়া বাথরুমের টব পর্যন্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। আলনায় পাট-করা ধবধবে তোয়ালে, একটা চৌকির উপর ধবধবে ফরাশ বিছানো, গোটা কয়েক পির্দা, তাহাতে

নূতন খোল ;—কাহার বাড়ি, কে এসব করিল, কখন কি ভাবেই বা করিল ভাবিলে যেন মাথা গুলাইয়া যায়।

বাহিরে ধৈর্য ধরিতে বলিয়া আসিয়া অতুল বলিল, "এঁদের চা-টার ব্যবস্থা ভাই পরিমল ?"

পরিমল, ধীরেন আরও সকলে তটস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, পরিমল বলিল "এসে পড়লো বলে।"

"বাথরুমে জল ?"

ধীরেন বলিল, "রেডি।"

অতুল বলিল, "আপনারা তা হ'লে মুখ-হাত ধুয়ে নিন। মলিনদার ওখান থেকে চা এসে পড়বে এক্ষুনি।"

দুইজনে একে একে বাথরুম হইতে ফিরিতে না ফিরিতে দুইটি লোকে প্রচুর জলযোগের সরঞ্জামের সঙ্গে খুব বড় একটা ফ্লাস্কে চা হাজির করিল। ভদ্রলোক কতকটা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, বলিলেন, "একি ব্যাপার ? যন্ত্রপাতি নিয়ে এলে যে আলাদিনের প্রদীপের খানিকটা ফিল্ম তোয়ের করে নিয়ে যেতে পারা যেতো।...না গা ?"

সঙ্গিনী হাসিয়া বলিলেন, "তাই না তাই ; আর তিনি অসুস্থ, তাঁকে এভাবে ব্যস্ত করা, কি কুণ্ঠিত যে হ'তে হচ্ছে আমায়—কি দরকার ছিল এ সবের ?"

অতুল বলিল, "দরকার হয়তো আপনার নেই, কিন্তু দরকার তাঁর আছে, দরকার রাজগাঁয়ের, দরকার, দরকার..."

ভাবের আতিশয্যে কণ্ঠনালী এমন আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, আর বলিতে পারিল না। পরিমল যোগাইয়া দিল, "দরকার আমাদের।"

ভদ্রলোক যেন একটা ছুতা পাইয়া হাসিয়া বাঁচিলেন, বলিলেন, "এই এতক্ষণে একটা কাজের কথা হয়েছে,—ঠিক, এসো, তা হ'লে সবাই বসে খাওয়া যাক্।"

পরিমল অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, বলিতে লাগিল, "তাই বললাম নাকি ? সে হয় না, আমি তা মীন্ করি নি ; আমাদের দরকার মানে..."

অতুল, ধীরেন এবং ভিতরের অন্যান্য সকলেও আপত্তি করিল, কিন্তু বনলতা দেবীর সঙ্গে আহারের গৌরব অর্জন করার বাসনাটা এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে, আপত্তিটা আপনা হইতেই ক্রমে ক্রমে কেমন যেন মিলাইয়া

গেল উঁহারাও ছাড়িলেন না। পাত্রের অভাব হইল না, মালী একটা আলমারি খুলিয়া চিনামাটির ডিশ্, প্লেট্, কাপ ইত্যাদি বাহির করিয়া দিল। বনলতা পরিবেশন করিলেন ; জলযোগ-পর্ব শেষ হইল।

সন্ধ্যা উতরাইয়া গিয়া অন্ধকার বেশ গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। পরিমল নামিয়া গিয়া একবার খবর আনিল, মোটর ঠিক হইতে এখনও প্রায় ঘণ্টা দুয়েক দেরি। জলযোগ শেষ হইলে বনলতা একটা সোফায় হেলিয়া বসিলেন, সঙ্গীও একটি আরাম-চেয়ারে বসিয়া রূপার কেস হইতে একটি সিগারেট বাহির করিলেন, অগ্নিসংযোগ করিয়া বলিলেন, "ওদের ডাকো ; একটু আলাপ-সালাপ করা যাক্ এবার।"

রাত হইয়া যাওয়ায় দলটা অনেকটা পাতলা হইয়াছিল, যাহারা বাকি ছিল আসিয়া ফরাশের উপর অথবা চেয়ারে আশ্রয় গ্রহণ করিল ; কয়েকজন বিনয়াধিক্যবশতঃ উপরে বসিতেই চাহিল না ; মেঝেয় পাতা শতরঞ্জির উপর দুই হাত জড়ো করিয়া বসিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাঁহার নিজের যে কোন মূল্যই নাই—ভদ্রলোকের একথা অগোচর ছিল না, বলিলেন, "নাও, তোমাদের যদি কিছু জিজ্ঞেস করবার থাকে তো ওঁকে জিজ্ঞেস করো।"

একটি ছেলে অত্যন্ত বিনীতভাবে, প্রায় বিগলিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "সব কথার কি উত্তর দেবেন উনি আমাদের দয়া করে ?"

ভদ্রলোক হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "তা বলে আপনি যদি জিগ্যেস করেন, টিপু সুলতান কোন্ সালে মরেছিল, সে উত্তর কি উনি দিতে পারবেন ?"

ছেলেরা অপ্রস্তুত হইয়া গিয়া বলিল, "না, সে কথা বলছি না, সে কথা…"

একটা চাপা হাসি উঠিল ; কি বলিতে চাহিতেছিল সেটা আর আপাততঃ বলা হইল না। একে একে খান-দশেক অটোগ্রাফ-বুক বাহির হইল। সাহস বাড়িয়া যাইতেছে, শুধু নাম-সহিতেই কেহ সন্তুষ্ট হইতে চাহিল না ; কিছু 'বাণী'ও ছাড়িতে হইল। এ পর্বটা শেষ হইলে সকলে আবার আসিয়া যথাস্থলে বসিল। একটু চুপচাপ গেল।

অগ্রণী হিসাবে অতুলই আলাপ শুরু করিল। সোজাসুজি বনলতার দিকে চাহিয়াই প্রশ্ন করিল, "আমাদের গ্রাম আপনার লাগছে কি রকম ?"

উত্তর হইল, "খুব চমৎকার।"

ধীরেন বসিয়াই অল্প একটু আগাইয়া বলিল, "কি রকম 'খুব চমৎকার' ?"

ভদ্রলোকের ঠোঁটে যেন একটু হাসি ফুটিল, সিগারেটে একটা চাপ দিয়া সেটা মিলাইয়া লইলেন। বনলতা বলিলেন, "কেমন এর মধ্যেই নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, কলকাতায় এতক্ষণ বাস, ট্রাম, মোটর—কান যেন ঝালাপালা করে দেয়।"



'হুবহু এই পশ্চার !...'

পরিমল পাশের ছেলেটিকে বলিল, "বলবার ভঙ্গিটা মার্ক করে যাস্‌, ওঁর কেবারিট্ স্টাইল।"

অতুল প্রশ্ন করিল, "তা হ'লে রাজগাঁয়ের কথা আপনি ভুলে যাবেন না—আমরা এ রকম আশা করতে পারি?"

ভদ্রলোক চোখ বুজিয়া সিগারেট টানিতেছেন। এরূপ নিগ্রহে যেন অভ্যস্ত, এই করিয়াই কাটাইয়া দেন।

বনলতা অল্প একটু সোজা হইয়া ডান হাতের উপর বাঁ হাতটা রাখিলেন, একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমায় এতই অকৃতজ্ঞ ভাবেন?"

সকলে সামনে ঝুঁকিয়া উৎকট আবেগে চাহিয়া ছিল, পরিমল 'উস্' করিয়া কতকটা সজোরেই শব্দ করিয়া উঠিল, তাহার পর রগ দুইটা টিপিয়া চাপা গলায় বলিল, "হুবহু এই পশ্চার, এই কথা! কোন্ প্লেটা, কোনমতেই নামটা মনে পড়ছে না,…আরে আরে!"

সব প্রশ্নের উত্তর পাইবে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া যে ছেলেটি প্রথমেই কথা কহিয়াছিল, সে কয়েকবার হাঁ করিয়া আবার সঙ্গে সঙ্গেই মুখ বন্ধ করিয়া লইয়া এতক্ষণ কাটাইল। তাহার প্রশ্নটা একটু বেখাপ্পা আর অদ্ভুত ধরণের বলিয়া সাহস সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না; হাসিমুখে এতবড় একটা কথা বলিতে শুনিয়া আর নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না; একটু উঠিয়া বলিল, "একটা কথা…"

বনলতা বলিলেন, "বলুন।"

ভদ্রলোক চোখ খুলিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে তাহার দিকে চাহিলেন। চোখাচোখি হইতে ছোকরা নিরুৎসাহ হইয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, "না থাক্।"

ভদ্রলোক আবার সিগারেটে মনঃসংযোগ করিলেন।

ধীরেন প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, কো-এডুকেশন সম্বন্ধে আপনার মত কি? এই—ছেলে-মেয়েদের একসঙ্গে স্কুল-কলেজে যাওয়া সম্বন্ধে?"

সঙ্গিনীর অবস্থা অনুমান করিয়া ভদ্রলোক নিজেই উত্তর দিলেন, চক্ষু বুজিয়াই বলিলেন, "মন্দ কি?"

অন্য প্রশ্ন আসিয়া এটাকে চাপা দিল।

"আচ্ছা, গান্ধীজী সম্বন্ধে আপনার মত কি?"

বনলতা আবার একটু নড়িয়া বসিলেন, যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া বলিলেন, "তিনি আমার প্রণম্য!"

পরিমলের আবার কোন্ প্লের কথা মনে পড়িয়া গেল, শব্দ করিয়া উঠিল, "ইস্!"

আবার প্রশ্ন হইল, "চরখার সম্বন্ধে?"

ভদ্রলোকই উত্তর দিলেন। সিগারেটটা সরাইয়া বলিলেন, "তাও প্রণম্যই, তবে দূর থেকে।"

বনলতা তাঁহার পানে চাহিয়া রাগের অভিনয় করিয়া বলিলেন, "আঃ!"

প্রশ্নকর্তার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি কাটেন চরখা?"

ছোকরা একটু থতমত খাইয়া গেল, অতুল বলিল, "ওর বলবার উদ্দেশ্য, মানে আপনি যদি বলেন..."

ভদ্রলোক বলিলেন, "হ্যাঁ, ঠিক, যার-তার কথা শুনে একটা কিনে বসা..."

সেই প্রথম-প্রশ্নকারী ছেলেটি ইহার মধ্যে আরও অনেকবার হাঁ করিয়াছে, মুখ বন্ধ করিয়াছে, আর থাকিতে পারিল না। ভদ্রলোকের দিকে একেবারেই না চাহিয়া, বেশ খানিকটা উঠিয়া বসিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "হ্যাঁ, আমি যা বলছিলাম, আপনার এই কানবালা,—ওই জোড়াটাই কানে দিয়ে কি আপনি 'তরুণের অভিযানে' অ্যাপিয়ার হয়েছিলেন?"

যাহাকে বলা, তাহার কানের অবস্থা যে কি হইল, অবশ্য বোঝা গেল না। ভদ্রলোকের মুখটাও গম্ভীর হইয়া গেল, ছেলেদের ফিসফিসানিও হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। অতুল সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "স্টারেদের ব্যবহারের জিনিস জাতির গৌরবের বস্তু কিনা? কেষ্ট তাই বলছিল; হলিউডে শুনেছি..."

ভদ্রলোক হাতঘড়িটা দেখিয়া বলিলেন, "মোটরের দেরি কত আর? রাত নটা হ'তে চললো, একবার দেখ তো ভাই।"

অতুল উঠিল, তাহার সঙ্গে ধীরেন উঠিল, কেষ্ট উঠিল, পরিমল উঠিল তাহার পর বাকি সকলেই প্রায় একসঙ্গে উঠিয়া পড়িল। গেটের কাছে আসিয়া একটা জটলা হইল। সবাই মুগ্ধ, অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে, কি চমৎকার মানুষ, একটু গুমর বলিয়া জিনিস নাই, আর ঠিক যেমনটি সিনেমায় দেখা, সেই চেহারা, সেই পোজ, সেই কথা বলিবার ভঙ্গি,—হাসিটা তো হুবহু সেই। সকলের মুখেই এক অনুরোধ—"অতুল ভাই, অন্ততঃ রাতটুকুও যাতে থেকে যান তার চেষ্টা কর়ো, চব্বিশ ঘণ্টা না হোক্, একটা রাতও রাজগাঁয়ে কাটিয়ে গেলে বলবার মুখ থাকবে..."

অতুল বলিল, "আমি ঠিক রাস্তা করে আনছিলাম, কথাটা পাড়বো পাড়বো, কেষ্টা কানবালার কথা তুলে সব মাটি করে দিলে।...তুই হতভাগা, এত জিনিস থাকতে কানবালার কথা তুলতে গেলি কেন?"

কেউ কি বলিতে যাইতেছিল; চারিদিক হইতে থাবা খাইয়া চুপ করিয়া গেল। অতুলের উপর জোর তাগিদ হইতে লাগিল, "রাত্তিরটা কোনমতে করতেই হবে রাজি। বলবি, আমরা এতগুলি—এতগুলি..."

পরিমল বলিল, "সোজা কথাটাই বল্ না, লজ্জাটা কিসের? একটা ভাগ্যি!...এতগুলি ভক্ত মিলে অনুরোধ করছি।"

অতুল ভাবিতেছিল, বলিল, "ভক্ত, সে তো আর ওঁকে গিয়ে বলা যায় না; ওটা হৃদয়ের কথা। যাই হোক, একটা ব্যবস্থা করছি, একটা ঠাউরেছি মতলব। ধীরেন, তুই সাইকেল নিয়ে বোঁ করে বেরিয়ে যা, মলিনদাকে বল্, ওঁরা রাত্তিরটা থেকে গেলেন, যত শীগ্‌গির হয় দুজনের খাবার করিয়ে পাঠিয়ে দিতে, বিছানাপত্র তো এখানে আছেই।"

রমেশ প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল, "কি মতলব?"

অতুল বাধা দিয়া বলিল, "ঠাউরেছে অতুল বোস একটা। তোমরা কিন্তু বাড়ি যাও সবাই, ভেজাল করলে চলবে না। কাল ভোরে আসবে সব। আমরা তিনজনে রইলাম, আর যতীন আর মদনও থাক না হয়। আর হরকালী, তুই সোজা গিয়ে দোত-কলম নিয়ে বসে যা, একটা অভিনন্দন, পদ্যতে।"

হরকালী বলিল, "বাঁধাবো কি করে?"

"বাড়িতে ঠাকুর-দেবতার একটা বাঁধানো পট-ফট নেই? খুলে তার ফ্রেমে এঁটে নিয়ে আসিস, পরে দেখা যাবে।"

রাত প্রায় এগারোটা। আহারাদি সারিয়া বনলতা আর তাঁহার সঙ্গী বাহিরের বারান্দায় বসিয়া আছেন। দুইজনেই দারুণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, কাহারও মুখে কোনো কথা নাই, সঙ্গী শুধু ঊর্ধ্বমুখ হইয়া নিঃশব্দে চুরুট টানিয়া যাইতেছেন।

উহাদের মধ্যে শুধু অতুল আসিয়াছে, মালীটাকে লইয়া হলের ওদিককার ঘর দুইটাতে শয্যা রচনা করিতেছে। বাকি চারজন এখনও আহার সারিয়া আসিতে পারে নাই। সবাই যে আসিতে পারিবে তাহারও কোন স্থিরতা নাই, লুকাইয়া পলাইতে হইবে তো?

বনলতা একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছেন, যে ফেঘোরে পড়িয়াছেন, দোষ দেওয়াও যায় না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আমি বলছি,

এদের মতলব খারাপ, আমার কানবালার দিকে নজর এইজন্তেই পড়েছিল। তুমি যাও পুলিসে খবর দিতে।"

চিন্তিত টানের মধ্যে প্রশ্ন হইল, "যদি হয়ই সেই ধরণের সব, তো আমি যেতে গেলেই পথ আটাকাবে না? চাই কি, খুনজখমও করতে পারে। আর পথই কি চিনি?"

বনলতা আবার এলাইয়া পড়িলেন, অসহায়ভাবে বলিলেন, "কি হবে?"

একবার চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন, "হয়েছে, ওরা এখন ওদিকে, তুমি চট করে বেরিয়ে পড়ো।"

"তোমায় একলা ওদের হাতে ফেলে রেখে?"

বনলতা আবার এলাইয়া পড়িলেন, বলিলেন, "তাই তো! আমার বুক ধড়ফড় করছে, ওরা রাত্তিরে একটা কাণ্ড করবেই, চারিদিকেই ডাকাতির খবর শোনা যাচ্ছে আজকাল।"

কাঁদকাঁদ হইয়া বলিলেন, "না হয়, এক কাজ করো।"

"কি?"

"ওদের ওই সর্দারকে ডাকো, আমার গায়ের গয়না সব খুলে দিই, প্রাণে রেহাই দিক্।"

"যদি তেমনই কিছু হয় তো সেই সময় খুলে দিলেই হবে। একটু চুপ করে দেখ, বিপদে অত উতলা হ'লে চলে না। আমার মনে হয়, ওসব কিছু নয়, আমার অনুমানটাই ঠিক।"

"তোমার মাথা-খারাপ হয়েছে।"

আবার একটু নিস্তব্ধতা। ওদিককার ঘর হইতে একটু-আধটু শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে, বোধ হয় মশারি খাটাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। একটু পরে বনলতাই বলিলেন, "একটা টায়ার এদিক-ওদিক কেটে দিলে, এক্স্ট্রা চাকাটা সরিয়ে ফেললে—কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পেলে না?"

"টের পাওয়ার যতক্ষণ সম্ভাবনা ছিল, ততক্ষণ এসব করে নি।"

"আমাদের আটকে রাহাজানি করবারই মতলব যদি না থাকে তো কেন করতে যাবে অমন? তোমার গা-জুরি কথা।"

"ওদের হিংসে নেই, শুধু আমারই আছে?"

"রসিকতা রাখো, ওদের হিংসেটা কিসের জন্তে শুনি?"

"একদল ভেতরে রইল, সঙ্গে খেলে পর্যন্ত। যারা বাইরে পড়ে রইল, তাদের হিংসে হবে না ?"

"তোমার মাথা-খারাপ হয়েছে।"

"মেনে নিলাম।"

"মেনে নিয়ে চুপ করে বসে থাকো।"

"তার একটা সুবিধে আছে; এক-আধটা মোটর গেলে চেঁচিয়ে থামাবো।"

সঙ্গিনীর বোধ হয় মনে হইল, মাথাটা নিতান্ত খারাপ হয় নাই। একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "মোটর তোমার জন্যে হুড়োহুড়ি করে আসবে !"

"সম্ভাবনা খুবই কম, রাত বেড়ে গেল, একটা লোকের পর্যন্ত মুখ দেখা যাচ্ছে না, তবু—যদি নিতান্ত…"

অতুল আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল, "বিছানা হয়ে গেছে, উঠবেন ?"

ভদ্রলোক বলিলেন, "এইখানেই একটু বসি, ফাঁকায় মন্দ লাগছে না; আপনি বাড়ি চলে যাবেন ?"

অতুল একটু হাসিয়া বলিল, "আমার কি মনুষ্যত্ব নেই ? এরাও আসছে, সবাই না থাকুক, পরিমল আর ধীরেন তো আসবেই, আপনাদের কোন রকম ভয় নেই।"

ভয়ের মধ্যে এক রকম কাটিতেছিল, সান্ত্বনার কথায় বনলতা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন, "দেখুন, ভয় আমরা সত্যিই পেয়েছি…"

সঙ্গী হাতটা টিপিয়া ইশারা করিলেন, কিন্তু বক্তৃীর তখন গলা কাঁপিয়া গিয়াছে, আর নিজেকে সংযত করিতে পারিলেন না, বলিলেন, "না, বাধা দিও না, এঁদের বলি সব…দেখুন, আপনাদের যদি গয়নাটয়নার দরকার হয় তো খুলে দিচ্ছি, আমাদের প্রাণে…"

আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

কাঁদিবার একটু অবসর দিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, "তুমি শান্ত হও, এদের মিছে অপবাদ দিচ্ছ। মোটর বিগড়েছে অবধি এরা এত করছে, যে…"

অতুলও প্রায় সংযম হারাইয়া ফেলিয়াছিল, কতকটা নাটকীয় ভঙ্গিতেই বসিয়া পড়িয়া বলিল, "উনি তো মিছে অপবাদ দিচ্ছেন না।"

ভদ্রলোক বিস্মিতভাবে চাহিলেন।

অতুল বলিল, "মিছে অপবাদ কি করে বলবো? আমাদের মধ্যেই কারও এই কীর্তি। বিশ্বাস করুন, কাল সকালেই তাকে আপনার পায়ের কাছে এনে হাজির করবো, যা সাজা হয় দেবেন। তবে এও বলি, যেই হোক্, আপনি যা বলছেন, ওরকম অভিসন্ধি তার ছিল না..."

নাটকীয় আবেগে তাহারও গলাটা কাঁপিয়া উঠায় আর অগ্রসর হইতে পারিল না।

* * *

অতুলের কণ্ঠে আন্তরিকতার সুর থাকায় অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেও, রাত্রিটা উভয়েরই এক রকম অনিদ্রায় এবং বাহিরে বাহিরেই কাটিল। ক্লান্তি এবং উদ্বেগে অবসন্ন হইয়া শেষের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, যখন উঠিলেন, একটু বেলা হইয়াছে। অনেকগুলি ছেলে একত্রিত হইয়াছে, আরও আসিতেছে। উভয়ে মুখে-চোখে জল দিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কালকের সেই শকার আসিয়া কাটা টায়ারটা প্রায় খুলিয়া বাহির করিয়াছে। কাছেই অতুল, তাহার হাতে এক জোড়া নূতন টায়ার আর টিউব। তাহার পাশে আর একটি ছেলে, হাতে গোটা দুই মালা আর ফ্রেমে-বাঁধানো ছবির মতো একটা কি।

ইঁহারা বাহিরে আসিতেই অতুল আর অপর ছেলেটি উঠিয়া আসিল, অন্যান্য ছেলেরাও পিছনে পিছনে আসিয়া ইঁহাদের চারিদিক দিয়া ঘিরিয়া ফেলিল—খুব একটা থমথমে সশ্রদ্ধ ভাব।

অতুল ভাবে একেবারে জরজর হইয়া রহিয়াছে, টিউব আর টায়ার জোড়া বাঁ হাতে গলাইয়া লইল, সঙ্গীর হাত হইতে মালা আর ফ্রেমটা লইয়া বনলতার পানে চাহিয়া হাত দুইটা অল্প একটু চিতাইয়া বলিল, "এই আপনাদের অপরাধী, যা ইচ্ছে হয় সাজা দিন।"

দুইজনে ঘুম হইতে সদ্য উঠিয়াই এমন অদ্ভুত সমাবেশের মধ্যে পড়িয়া হতভম্ব হইয়া গিয়াছেন। নির্বাক হইয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। অতুল বলিয়া চলিল, "কিন্তু বিশ্বাস করুন, অপরাধীর কু-অভিসন্ধি ছিল না, ওসব দুর্বলতার সে বহু ঊর্ধ্বে, তার একমাত্র দুর্বলতা—সে রাজগ্রামকে ভালোবাসে,

আর তার একমাত্র বাসনা ছিল যে—অন্ততঃ একটা রাত কাটিয়েও আপনি সেই রাজগ্রামের ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে…"

ভদ্রলোক বুঝিয়াছিলেন, বাধা দিয়া বলিলেন, "দাঁড়াও, আগে ওই টায়ার আর টিউবটা ফিরিয়ে আসতে বলো, ফিট্ করে ফেলুক।"

ভাবের ঘোরে বাধা পাইয়া অতুল একটু মুষড়াইয়া গেল, হাত হইতে টায়ার আর টিউব বাহির করিয়া পরিমলের হাতে দিয়া বলিল, "যাও ভাই, দিয়ে এসো।"

পরিমল প্রশ্ন করিল, "আর কাটা টায়ার-টিউব জোড়াটা রাজগাঁয়ের সম্পত্তি হয়ে থাকবে তো? স্মৃতিচিহ্ন…"

অতুল করুণ আবেদনের নেত্রে বনলতার পানে চাহিল। মেয়েছেলের মন বোধ হয় গলিয়া যাইত, কিন্তু ভদ্রলোক ভাবরাজ্যে অনেক ঘা খাইয়াছেন, ফাটা টায়ারটার মূল্য সম্বন্ধেও পুরা জ্ঞান আছে, বলিলেন, "না না, সে কি ঠিক হয়, ফাটা টায়ারটি দেখে ক্রমাগতই বুকে একটা অশ্রু ঠেলে উঠবে, সেটা আমরা প্রাণ ধরে কি করে হ'তে দিই?"

অতুল একটা বুক-ভাঙা নিশ্বাস মোচন করিল, বলিল, "তবে তাই হোক, যাও ভাই। একটা রাত যে এঁকে ধরে রাখতে পেরেছিলাম এই আমাদের পরম সান্ত্বনা।"

তাহার পর ফ্রেমটা সোজা করিয়া ধরিয়া আবেগ-কম্পিত স্বরে অভিনন্দনটা পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

[শনিবারের চিঠি, কার্তিক ১৩৫০]

কালিকা

যাহারা সৃষ্টিরহস্যের কিছু কিছু খবর রাখে তাহাদের মতে নটু গোঁসাইয়ের কন্যা রাধারাণীকে গড়িতে বিধাতাপুরুষ একটা মস্ত বড় ভুল করিয়া বসিয়া আছেন—মেয়ে না হইয়া রাধারাণীর বেটাছেলে হইয়া জন্মানো উচিত ছিল। অমন আদর্শ বৈষ্ণব পরিবার, বাড়ির কুকুর-বেড়ালটি পর্যন্ত যেন তৃণাদপি সুনীচ, মাঝখানে তালগাছের মতো খাড়া, রুক্ষ ঐ ধিঙ্গী মেয়ে! একেবারে বেমানান। লোকে বলে, "নটু তপস্যা করে মেয়ে-পেল্লাদ পেয়েছে—না ডোবে জলে, না পোড়ে আগুনে।"

নূতন কলেবরের প্রহ্লাদজীর রূপের পরিচয় এইখানেই একটু দিয়া ঝাখা ভাল। কালো, বেশ স্পষ্টভাবেই কালো; ভারবর্ণ কি ঐরকম কোন গোলমেলে বিশেষণ হাতড়াইবার দরকারই হয় না। হাড়কাট মোটা, তাই গড়নটা খুব গোলালো নয়। চওড়া পিঠের উপর একরাশ চুল; অন্যত্র প্রশংসা পাইত, এ মেয়ের কাঁধে, পিঠে সমস্তদিন নাচিয়া-কুঁদিয়া, ফুলিয়া-ফাঁপিয়া একটা বিশৃঙ্খল বোঝা হইয়া থাকে। মাত্র চোখ দুইটির নিন্দা করা চলে না,—ডাগর, টানাটানা; তবে যাহারা খুব প্রশংসা করে তাহাদেরও স্বীকার করিতে হয়—"হ্যাঁ, একটু পুরুষালি ভাব আছে বইকি চাউনিতে—তা যা দস্যি মেয়ে!"

বাপ-মায়ের ভাবনার কূলকিনারা নাই, বয়স তো আর মুখ চাহিয়া কথা কহিবে না? মেয়ে ভাবনার কিনারা দিয়াও যায় না। ঘুঁড়ি উড়ায়, সাঁতার কাটে, জল ছাঁচিয়া, ডিঙি ভাসাইয়া হাল টানে; পূজা আসিলে যাত্রার আসর সাজায়, ভাঙা আসরে দল লইয়া রাবণের অভিনয় করে। যখন বিয়ের লগনসা নামে, শানাইয়ের বাদ্যে গ্রাম মুখরিত হইয়া ওঠে, তাহার বাপমায়ের মনে আশার শিখাটি নিরাশার ধূমে ক্রমে আচ্ছন্ন হইয়া আসে, রাধারাণী সদলবলে বরযাত্রীদের বিপন্ন করিবার নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবনে মনেপ্রাণে মাতিয়া থাকে।

সন্ধ্যার রঙে রং মিশাইয়া যখন বাড়ি ঢোকে, মায়ের কাছে সেই এক ধরণের বাঁধা অভ্যর্থনা,—"এলেন গেছো মেয়ে! ওলো, তুই আবার ফিরলি কেন, গাছের ভূতপেত্নী বেহ্মদত্যি ভাগাড়ে গেছে? নিতে পারলে না তোকে?"

অত শান্ত নিরীহ মা, কাহারও কাছে মুখ তুলিয়া কথা কহিতে জানে না; সন্ধ্যায় মেয়ের শ্রীছাঁদ দেখিয়া কিন্তু তাহারও আর ধৈর্য থাকে না।

মেয়ের কিন্তু এতটুকু খেদ নাই, দুঃখ নাই, গ্রীবাভঙ্গি করিয়া উত্তর দেয়, "আহা! কি মেয়েই পর্শ করেছ! ভূত-পেত্নীতে দূর থেকে দেখেই পালায়, তায় আবার নিতে আসবে…"

—হাসিয়া ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে মার হাতের কাজ কাড়িয়া লইয়া অমিত উৎসাহে লাগিয়া যায়—কুটনা কোটা, বাসন মাজা থেকে ভাইয়ের মুখ খাওয়ানো পর্যন্ত যে কাজই হোক্ না কেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দিনের কীর্তি-বিবরণী চলিতে থাকে: "বুঝলে মা, বাঁধের ধারে আজ থেকে যাওয়া ঘুচিয়ে

দিলে ডাকরা ছোঁড়াটা। কুঠির সায়েব তাঁবু ফেলেছে, তুই জবাব করতে গেলি কেন বাপু? আমার উল্টে বলে—'তুই তো শিকিয়ে দিয়েছিলি'…বোঝ, হ্যাপা, আমার কি দায়টা পড়েচে শেকাতে যাবার? মেয়েমানুষ আমি। মাঝখান থেকে এমন চমৎকার ফুলগুলো পাঁচভূতের পেটে যাবে। আর এই সময় নদীতে যা গঙ্গার কাঁকড়া আসতে লেগেচে মা!…হ্যাঁ, তোমার যেমন কথা, আঁচলে রক্ত লাগতে যাবে কেন? বা রে, কনুই ছেঁচলে যাবে কেন সুস্থ শরীরে?…দেখি, তাই তো গো!—এ মা, মাথনার কাণ্ড; আমি অত করে পাড়লাম পেঁপেটা, আর পোড়ারমুখো কি না গাছের ওপরে গিয়ে কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দিলে, অবলা মেয়েমানুষ পেয়ে! তেমনি হয়েওছে, তিনমানুষ ওপর থেকে পড়ে গতর চুর হয়ে গেছে বাছাধনের। রাঙীবামনীর মুখের গেরাস খাবে—খাও!…"

গেছো মেয়ের পাকা দেখা হইল গাছের উপরেই। কালিকাপুরের বিষ্ণু ভট্টাচার্য চরণডিহির কালভৈরবীর তলায় মানৎ পাঁঠা বলি দিয়া ফিরিতে-ছিলেন—রাস্তার ধারে, পেয়ারা গাছের ডালে একটি বারো-তেরো বৎসরের মেয়ের উপর নজর পড়িল। নজর না পড়িয়া উপায় ছিল না।—মেয়েটির গাছকোমর বাঁধা, খালি গা, এলো চুল! ডালের ঊর্ধ্বে উপবিষ্ট একটি ছেলেকে ভূমিসাৎ করিবার শুভ উদ্দেশ্যে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া দোলা দিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হাসি!

বিষ্ণু ভট্টাচার্য কাছাকাছি কয়েক বাড়ি ঘুরিয়া পরিচয় লইলেন, তাহার পর সরাসরি রাধারাণীদের গৃহে গিয়া তাহার পিতার নিকট মেয়েটিকে পুত্রবধূরূপে ভিক্ষা করিলেন। নটু গোঁসাইয়ের কথাটা বুঝিতে এবং বিষ্ণু ভট্টাচার্যের মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ মিটিতে যা একটু দেরি হইল, তাহার পর কথাবার্তা স্থির হইয়া গেল। অন্তরের উল্লাস সাধ্যমত সংযত করিয়া নটু গোঁসাই বলিলেন, "তাহ'লে পাকা দেখাটা কবে সুবিধে…"

বিষ্ণু ভট্টাচার্য উত্তর করিলেন, "পেয়ারাগাছের মগডালে যাকে আমার পাকা দেখেছি, আর দেখেই চিনেছি; আর দ্বিতীয়বার দেখার দরকার নেই।"

বৈশাখের মাঝামাঝি ঘটনা, জ্যৈষ্ঠমাসের গোড়ায় বিবাহ হইয়া গেল। শ্বশুরের আগ্রহাতিশয্যে রাধারাণী বিয়ের পর আর বেশিদিন বাপের বাড়ি থাকিতে পাইল না, আশ্বিন পড়িলে বিজয়ার শুভদিনে শ্বশুরবাড়ি চলিয়া

গেল। মা মেয়ের চোখের জলের সঙ্গে নিজের চোখের জল মিশাইয়া বলি "সেখানে গিয়ে আর ও সব যেন করতে যেয়ো না মা, রাধারমণ যখন মু তুলে চাইলেন..."

মেয়ে, ফোঁপানির মধ্যে যতটা সম্ভব, স্পষ্ট বলিল, "ফিরে আসতে দাও তারপর তোমার রাধারমণকে যদি না..."

মা মুখের উপর হাত দিয়া অমঙ্গলসূচক কথাটা আর শেষ করিতে দিল না।

শ্বশুর কালিকাপুরে আসিয়া বধূকে একবার বাড়ির বিস্তীর্ণ সীমানার মধ্যে ঘুরাইয়া আনিলেন, "বলিলেন এই তোমার পেয়ারা গাছ, মা ; ঐ আম-জাম জামরুলের বাগান ; সাঁতার কাটার জন্যেও তোমায় বাইরে যেতে হবে না ; দেখছই, মস্ত বড় পুকুর সামনে পড়ে আছে। কাজের দিকে যাবে না, তার ঢের বয়েস আছে ; কাজের মধ্যে কাজ রইলো এই মন্দিরটি। নিলে তো মার সেবার ভার ?...বেশ !...তোমার শাশুড়ী যাওয়ার পর থেকে মার সেবার ত্রুটি হচ্ছিল বলেই আমায় তোমাকে পাইয়ে দিলেন..."

একটু থামিয়া বধূর মাথায় হাত দিয়া হাসিয়া বলিলেন, "নিজের কাজ নিজে করবার ইচ্ছে হয়েছে এবার, না গা মা ?"

বধূ কথাটা বুঝিল না অতশত, তবুও মাথা নাড়িয়া জানাইল, "হ্যাঁ।"

ঘোর শাক্ত লোকটি। প্রকাণ্ড দেবোত্তর সম্পত্তির মাঝখানে বাড়ির লাগোয়া শ্যামা-মন্দির। নিকষে গড়া মূর্তি, পায়ের তলে শ্বেত-পাথরের মহাকাল স্তিমিতনেত্রে শয়ান। মূর্তি বেশি উঁচু নয়, চাহিতেই প্রথমে বরাভয়ে তোলা দক্ষিণ হাতটির উপর নজর পড়ে—রক্তাভ করতল, তর্জনী আর মধ্যমা আঙুল দুইটি ঈষৎ লীলায়িত, মুখখানি ডাহিনে একটু তোলা, আকাশ-নিবদ্ধ উন্মনা দৃষ্টি—একটি বারো-তেরো বৎসরের কিশোরী নিজেরই ভাবের সম্মোহনে যেন হঠাৎ নিশ্চল হইয়া গিয়াছে।

কোথাও এতটুকু পাষাণত্ব নাই, শিল্পী নিজের বাসনাতপ্ত প্রাণ ঢালিয়া দিয়া যেন সব কঠোরতা গলাইয়া লইয়াছে। দিগ্বসন অঙ্গখানির রোম-রোম মাতৃত্বের সুষমায় পূর্ণ।

এর সঙ্গে সেদিনের পেয়ারাগাছের মেয়েটির কোথায় একটি মিল ছিল—খুব সূক্ষ্ম, শুধু তেমন চোখেই ধরা পড়ে। তাই বিষ্ণু ভট্টাচার্য তাহাকে সযত্নে

আনিয়া বাড়িতে তুলিলেন। সবচেয়ে ভালো লাগিল তাহার নামটি—রাধারাণী! বিষ্ণু ভট্টাচার্যের মনে হইল এই রহস্যময়ী মেয়েটির এ যেন ঘোর একটি প্রবঞ্চনা, নামের অন্তরালে আত্মগোপনের প্রয়াস, একটি ছলনা; ঐ পাষাণময়ী মায়ের হাতের ছিন্নমুণ্ডে, কটিতটের করমালিকায় যে রকম ছলনায় আভাস লুকানো আছে।

বধূ পরুষ—নাম ধরিয়াছে কোমল! মা মমতাময়ী, হাতে লইয়াছে ছিন্নমুণ্ড।

যে ধরা দিতে চায় না, সেই মনকে প্রবলতর বেগে টানে।

বিষ্ণু ভট্টাচার্যের রাধারাণীকে পুত্রবধূরূপে ঘরে আনার দরকার ছিল বটে, কিন্তু পুত্রের বিবাহ দেওয়ার মোটেই তাগাদা ছিল না। তাহাকে রাধারাণীর আসার উপলক্ষরূপে দাঁড় করানো হইল মাত্র।

কালীপদর বয়স বছর চৌদ্দ হইবে, মাথায় রাধারাণীর চেয়ে মুঠাখানেকও বেশি হয় কি না হয়। বাপের সম্পত্তি আছে, খায়দায়, নিজের খেয়ালখুশি লইয়া থাকে। সকালে একটু সংস্কৃত পড়িয়া আসে, রাত্রে মৌলবী আসিয়া খানিকটা ফারসী পড়াইয়া যায়। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন ইংরাজ সবে এদেশে পা দিয়াছে, শিক্ষার আসরটা সংস্কৃত-ফারসীর মধ্যে ভাগাভাগি করা।

ফল কথা, রাধারাণী যে একটা স্বামী-বিভীষিকা লইয়া বাড়ি হইতে বিদায় লইয়াছিল, শ্বশুরবাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে সেটা প্রায় তিরোহিত হইয়া গেল। সে দেখিল—পুঁটে, গোবরা, মাখনা গোছেরই তাহার একটি সঙ্গী জুটিয়া গিয়াছে—বরং আরও একটু বেশি অন্তরঙ্গ। জীবনের এই নূতনত্বটুকু পুরাতন ছাঁচে ঢালিয়া লইতে তাহার মোটেই দেরি হইল না।

সংসারটি খুব ছোটখাট, তাহার গতির পথে কাহারও সহিত ঠেলাঠেলি হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রথম—শ্বশুর, তিনি প্রতিমাটি আর মন্দিরটি লইয়াই থাকেন। বাড়িতে বিধবা পিস্-শাশুড়ী—ঘোর বৈষ্ণব পরিবারের কুলবধূ। অল্পভাষী আর বেজায় রাশভারী মানুষটি—আসিয়া অবধি জগদম্বায় পাঁঠা খাওয়া বন্ধ করিয়াছেন। প্রথম একদিন বলির পর এমন কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করিয়া তুলেন যে, মা নাকি সেই রাত্রেই বিষ্ণু ভট্টাচার্যের নিকট আবির্ভাব হইয়া কাতরভাবে বলেন, "বাবা বিষ্ণু, ঢের হয়েচে, এত হেনস্তার চেয়ে বরং আমায় কুমড়ো-বলিই দিস্ তদ্দিন।"

কথাটা বিষ্ণু ভট্টাচার্য বড় দুঃখের সহিত দু'একজনের কাছে হাজি করিয়াছেন, ভগ্নীরও কানে উঠিয়াছে, কিন্তু কোন প্রতীকার হয় নাই। তবে এমনি তিনি কোন কথাতেই থাকেন না। ভিতরবাড়িতে জগন্নাথের বিগ্রহ নানামতে তাঁহারই সেবায় দিন কাটে।

একটি ঝি আছে, একটি বামুনের মেয়ে আসিয়া রাঁধিয়া দিয়া যায়। এই সংসার ;—দুইটি ঠাকুর, আর এই কয়টি মানুষ। প্রকাণ্ড বাড়ি—পূজাপার্বণে কাজেকর্মে আত্মীয়-স্বজনদের জোয়ার আসে, ভাঁটার সময় অধিকাংশ ঘর তালাবন্ধ থাকে।

রাধারাণীর কাজ বাঁধা। ভোরে উঠিয়া স্নান সারিয়া, এলোচুলের একটি সরু গোছায় একটা গেরো দিয়া, কালীপদকে ডাকিয়া তোলে। দু'জনে ফুল তুলিতে বাহির হইয়া যায়। গাছে উঠিবার পালা থাকে কালীপদর। অশোক আছে, পলাশ আছে, চাঁপা আছে। সুবিধা পাইলে কালীপদ ফুল তুলিয়া রাধারাণীর কোঁচড়ে ফেলিয়া দেয়। যখন হাতের কাছে পায় না, কিংবা যখন আগ্‌ডালের দিকে অগ্রসর হইতে সাহস পায় না, পা দিয়া দুলাইয়া দুলাইয়া রাধারাণীকে ধরাইয়া দেয়। রাধারাণী হাসিয়া বলে, "ঘেন্না ধরালে তুমি পুরুষ নামে, ভয়েই সারা! কি বলবো, আমার হাত নিস্‌পিস্ করছে, নেহাৎ নাকি ইয়ে হয়েছি, তাই···"

'ইয়ে' হওয়ার জন্য যে বড় একটা আটকায় এমন নয়। গাছটা একটু ঝাঁকড়া হইলে, এদিক ওদিক দেখিয়া লইয়া বধূ কখন উঠিয়াও পড়ে, এ-ডালে ও-ডালে পা দিয়া অসম্ভব অসম্ভব জায়গায় গিয়া কোঁচড় ভরিতে থাকে ; কালীপদ ত্রস্তভাবে ডাকিতে থাকে, "চলে এসো,···রাধু, শুনছ ? তোমার পায়ে পড়ি···এইবার তাহ'লে আমি চেঁচাবো···চেঁচাই ?···ও বা···!"

শাসনের ভঙ্গীতে রাধারাণীর চোখের তারকা আয়ত হইয়া উঠে, বলে, "ডাকো বাবাকে, শেষ করেছ কি আমি হাত-পা ছেড়ে নাপিয়ে পড়েছি—বাবা এসে দেখবেন তালগোল পাকিয়ে মরে পড়ে আছি···"

যা মেয়ে, ও তা স্বচ্ছন্দে পারে, কালীপদর আর সন্দেহ থাকে না। বেচারী জোর কাকুতি-মিনতি লাগাইয়া দেয় ; লোভ দেখায় ; লম্বা কিছু একটা আঁটে আঙুলের দ্বারা এই ধরণের একটা মুদ্রা সৃজন করিয়া বলে, "দেখ, এই এনে দোব, ঘোষালদের পুকুরপাড় থেকে, পেকে হলদে হয়ে রয়েছে, সত্যি।"

জিনিসটা কামরাঙা। তবে রাজি হওয়া না-হওয়া নির্ভর করে রাধারাণীর মেজাজের উপর। এক এক দিন যেন কোন মন্ত্রের আকর্ষণে নামিয়া আসে,



'...রাধু, শুনছ?...'

কামরাঙার নামে মুখে এত লালা জমিয়া ওঠে যে কথা কহা শক্ত হইয়া পড়ে; সামলাইবার চেষ্টায় মুখে একটা চক্‌চক্ শব্দ করিতে করিতে বলে, "ঠিক বলছ? ঠিক? মা কালীর খাঁড়ার দিব্যি—মিথ্যে বললে তেরাত্তির কাটবে না... আচ্ছা, তিনসত্যি গালো..."

একেবারে তেরাত্তির লইয়া গালাগাল! মুখটি ভার করিয়া কালীপদ বলে, "আমি না তোমার বর হই?"

এ-বয়সের আলাপনে এক একদিন কথায় কথায় ঝগড়াও হয়; আবার কোনদিন রাধারাণী একটু অপ্রতিভ বা অনুতপ্ত হয়—যেমন মেজাজ থাকে; বলে, "হ্যাঁ, তাই আমি বললাম নাকি? চললাম্—যদি মিথ্যে বলো—'বদি'র কথা..."

চলিতে চলিতেই হয়তো হাতটা ধরিয়া ধীরে ধীরে বলে, "সে সব কিছু হবে না, আমি রোজ মা-কালীর কাছে মাথা খুঁড়ি—'হে ঠাকুর, দেখো, যেন...' "

ঝোঁকের মাথায় এটুকু বলিয়া আবার লজ্জা হয়, হাতটা ছাড়িয়া দিয়া বলে, "হ্যাঃ, মাথা খুঁড়ি না আরও কিছু, মিছিমিছি বলছিলাম; বয়ে গেছে আমার পরের জন্যে মাথা খুঁড়তে!"

পূজার যোগাড় করিবার সময় আর এক রূপ, রাধারাণী তখন মহা তাত্ত্বিক একজন।—চন্দন ঘষিতে ঘষিতে, কিংবা স্তরে স্তরে বিল্বপত্র গুছাইতে গুছাইতে প্রশ্ন করে, "তাহ'লে গিয়ে কালী কার মেয়ে হ'লেন, বাবা?"

শ্বশুর হাসিয়া উত্তর দেন, "উনি আবার কার মেয়ে হ'তে যাবেন, মা? বিশ্বপ্রসবিনী, উনিই তো সবার মা।"

"তবুও তো কেউ না কেউ বাপ-মা ছিলই। শিবঠাকুরের সঙ্গে বিয়ে দিলে কে?—কালী তো আর ফিরিঙ্গী নন্, বাবা; তাদের শুনেছি নাকি..."

"পাগলী মেয়ে!" শ্বশুর বাধা দিয়া বলেন, "ওদের কি আবার বিয়ে দেওয়ার জন্যে বাপ মায়ের দরকার হয় মা?—প্রকৃতি আর পুরুষ—অনাদি কাল থেকেই ওদের লীলা..."

"আমিও তাই বলি। বাপ-মা থাকলে একটু ব্যবস্থা হ'তই। দেখনা, গায়ে একখানি গয়নার পর্যন্ত বালাই নেই;—আহা!...আর রাধারমণের দেখনা বাবা,—বাবা হ'লেন বসুদেব, নাহয় ধরো নন্দই হ'ল, তিনিও তো হাঘরে ছিলেন না? কেমন গয়নাগাঁটি, মোহনচুড়ো, রেশমের কাপড়ে জমজম করছেন ঠাকুর!...আর এদিকে দেখনা,—কপালগুণে বরটিও তেমন জুটেছেন...আহা!"

হয়তো প্রতিমার দিকে চোখ তুলিয়া চায়। শূন্যদৃষ্টি উদাসিনী প্রতিমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া কেমন যেন একটা মায়ায় মনটি সিক্ত হইয়া আসে। ক্রমে অন্যমনস্কতায় হাতটি শিথিল হইয়া আসে,—আহা, বড় যেন রূঢ় কথা বলা হইয়াছে; ওঁর বাপ-মা থাক্ না থাক্, উনি তো সবার মা?—ঠিক হয়

নাই কথাটা···হঠাৎ মনে পড়িয়া যায়—বিয়ের কয়েকদিন আগে কি-একটা কড়া কথায় তাহার নিজের মায়ের চোখদুটি এই রকমই করুণ হইয়া উঠিয়াছিল···হারুদের মার মুখখানি চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে—স্বামী বিছানায় পড়িয়া, একা মেয়েমানুষ বাড়ি বাড়ি পাট সারিয়া দুপুরে ফিরিতেই ছেলে-মেয়েতে সাতটি যখন ঘিরিয়া ফেলিত...আবার ছোট মেয়েটির নিত্য রাঙা কাপড়ের ফরমাস···নিজে এদিকে চিরকুট-পরা, সাত জায়গায় তালি···কোলে তুলিয়া লইয়া চুমা খাইতে খাইতে বলিত,—"হ্যাঁ, দোব বইকি, দোব না?"—এই রকম ঠিক মুখের ভাবটি হইত। রাধারাণীর মাতৃবিরহিত মনের সামনে এই রকম কত মার ছবি ফুটিয়া ওঠে—যত যায়গায় যত মা দেখিয়াছে, সবার—ঐ রকম সব চোখ, বেদনাতুর দৃষ্টি সব ছাড়াইয়া যেন কোথায় গিয়া পড়িয়াছে; কেমন যেন একটা অতৃপ্তভাব—মা মা মাখানো।

ঠাকুরে মানুষে মিশিয়া একাকার হইয়া যায়—হঠাৎ মায়ের জন্য বড় মন কেমন করিয়া ওঠে, আর তেমনি আকস্মিক ভাবেই প্রতিমার উপর মন করুণায় ভরিয়া ওঠে—"কোথায় তোমার ব্যথা, মা? তুমি এমন সর্বহারা কেন হ'তে গেলে?···"

শ্বশুর আড়চোখে দেখেন—বধূ হাঁটুর উপর চোখ ঘষিয়া অশ্রু মুছিতেছে। টোকেন না।

স্বামীর কাছে রাধারাণী অন্তরের বেদনাটা না জানাইয়া থাকিতে পারে না। বলে, "আহা, আমার এত কষ্ট হচ্ছিল দেখে আজ, কে জানে কেন! ঠাকুরেরা হোন্ ঠাকুর,—কিন্তু এ তো মানুষের মতন!···"

কালীপদ এক কথায় সব উল্টাইয়া দেয়, "দেখতো বোকামি মেয়ের? কালীঠাকুর কিনা ভালোমানুষ! অমন ভয়ংকর ঠাকুর নাকি আছে?—পারো তুমি স্বামীর বুকে পা দিতে?···ডাকাত যে ডাকাত, তাকেও কালীপূজো করতে হয়···"

রাধারাণী একটু অন্যমনস্ক হইয়া যায়। বলে, "তা জানি মশাই, আমায় আর বলতে হবে না।"

ছেলেবেলার একটি দৃশ্য মনে পড়িয়া যায়। সে সাজিত কালী, গোবরা সাজিত ডাকাত, নন্তেদের পাকা-ফলে-রাঙা 'মোহনভোগ' আমগাছটা হইত রাজবাড়ি...

কতকটা এই সব স্মৃতিতে, কতকটা স্বামীর কালী-গুণকীর্ত্তনে মনের সেই দুর্বল করুণ ভাবটি কাটিয়া যায়। আবার পূর্ণ উৎসাহে গাছে ওঠা, জলে ঝাঁপাইঝোড়া, বাগান কাঁপাইয়া হাসি, ছুটাছুটি, দাপাদাপি চলে; স্বামীর বুকে পা ওঠে না বটে, তবে 'ফরমাসে, ধমকানিতে, টানাহিঁচড়ানিতে সে বেচারীকে যে নির্যাতনটা সহ্য করিতে হয়, তাহার তুলনায় শিবঠাকুরকে ভাগ্যবানই বলা চলে। কালীপদ বড় দুঃখে এক একদিন বলিয়া ফেলে, "তুমি ভাই কালীঠাকুরের বাবা! স্বামী বলে আমায় একটুও মান্য করো না..."

মাঝেরপাড়ায় নবনারীতলায় যাত্রা ছিল; 'সুভদ্রা-হরণ' পালা; বিকালবেলা শেষ হইল। পিসীমা যে রকম গুছাইয়া-সুছাইয়া নবনারীর মন্দিরে মালায় বসিলেন, শীঘ্র উঠিবার সম্ভাবনা নাই। কালীপদ সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার জন্য থাকিয়া গেল। অর্জুন-সুভদ্রার কেমন একজোটে কাজ! রাধারাণীর মনে অব্যক্ত কি একটা হইতেছিল, বলিল, "তুমি তার চেয়ে চলোনা কেন?—ঝি থাক্।"

কালীপদর মনে অর্জুনের বীরত্বের আঁচ তখনও লাগিয়া আছে, বলিল, "তা কি হয়? একজন বেটাছেলে থাকা ভালো।"

রাধারাণী নিচের ঠোঁটটা একবার উল্টাইল, বিদ্রূপে; তাহার পর ঝিয়ের হাত ধরিয়া বাড়িমুখো হইল।

পথে কথায় কথায় বলিল, "সুভদ্রাঠাকরুণ কেমন কড়া হাতে রাশ বাগিয়ে ধরলো, ঝি!"

ঝি বলিল, "সব মেয়েমানুষেই পারে।" তাহার পর রাধারাণীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে বলিতেছিল, "আহা, দিদি ঠাকরুণ যেন কিছু জানেন না,—কেন মেয়েমানুসের ঘোড়া হ'ল সোয়ামী, রাশ মানে হ'ল..."

এমন সময় তাহাদের ঠিক সামনে একটা মাটির ঢেলা পড়িয়া চুর হইয়া গেল এবং তাহার সঙ্গে বাঁধা একটা কাগজের টুকরা ছিটকাইয়া রাস্তার ধারে পড়িল। ঝি, "ও মাগো!" বলিয়া গুটাইয়া-সুটাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

রাধারাণী একবার চারিদিকে দেখিয়া লইল—কেহ কোথাও নাই। একটু আগাইয়া গিয়া কাগজটা তুলিয়া লইল। নিজে পড়িতে জানে না; ঝি পড়িয়া দিল—তাহার পরিবারে সব যাত্রার গান বাঁধে; লেখা আছে—"মার মহাপূজায় রক্ত তর্পণ। শনিবার, তিথি শ্রাবণ-অমাবস্যা। ভৈরব।"

ছ'জনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল। 'সুভদ্রা-হরণ' দেখিয়া যে অনুপ্রেরণা জাগিয়াছিল তাহা আর বেশিক্ষণ রহিল না, বিশেষ করিয়া স্থির ; জোরে হাঁটিতে হাঁটিতে সে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। বিষ্ণু ভট্টাচার্য মন্দিরে ছিলেন, চিঠিটা তাঁহার হাতে পৌঁছিল।

কথাটা রাষ্ট্র হইতে দেরি হইল না। তিন জায়গায় এই রকম চিঠি পড়িয়াছে, পাড়ার ঠিক তিনটি কোণে,—ওদিকে অধর চৌধুরীর বাড়ি, গ্রামের অপর প্রান্তে সনাতন চক্রবর্তীর বাড়ি, আর মাঝখানে এই বিষ্ণু ভট্টাচার্যের বাড়ি। ভৈরব-ডাকাতের প্রথাটাই এই ; লোকে এই জন্ম বলে—"ভৈরব সর্দারের মহাজাল পড়েছে।"

কিন্তু এ তো সকলেরই জানা কথা যে মার আদেশ না পাইলে ভৈরব বাহির হয় না, তবে এ গ্রামে মার পূজায় কি ত্রুটি হইয়াছে ?

বিষ্ণু ভট্টাচার্য সমস্ত রাত মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ধর্ণা দিয়া পড়িয়াছিলেন, সকালে রুদ্ধ দ্বারের উপর করাঘাত পড়িল। দ্বার উন্মুক্ত করিয়া তিনি চৌকাঠের উপর দাঁড়াইলেন। সামনে দালান ভরিয়া একদল লোক। মুখপাত্র হিসাবে বৃদ্ধ নিবারণ ঘোষাল আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, "বিষ্ণু, ধন্না দিয়ে কার কাছে সাড়া পাবে?—মাকে কি রেখেছ? বলি-হীন শক্তি-পূজো—এ অনাচার গ্রামে সইবে না, হয় আজই ন'টি বলিদানের ব্যবস্থা করো, না হয় মাকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে এসো—একের পাপে সারা গ্রাম যে যায়!"

বিষ্ণু ভট্টাচার্য বলিলেন, "আমার কি অসাধ কাকা? তবে…"

চারিদিকে রব উঠিল, "তবে-টবে নয়, পাঁঠার সব ঠিকঠাক, আমরা নিয়ে আসছি, আজ রক্তের স্রোতে গ্রামের পাপ ভাসিয়ে তবে কথা…"

দলটা আস্তে আস্তে কিছুক্ষণের জন্ম একটু পাতলা হইল, তাহার পর ক্রমেই আবার জমাট বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল,—লোকের হাঁকডাকে, 'মা-মা' শব্দের সঙ্গে একপাল শিশুছাগের ত্রস্ত চিৎকার মিলিয়া জায়গাটাকে সরগরম করিয়া তুলিল।…ক্রমে পূজা সুরু হইল, হাড়িকাঠ পোঁতা হইল, একটি ছাগশিশুকে স্নান করাইয়া মন্দিরে উঠানোও হইল। মন্দির হইতে গলা বাড়াইয়া একজন প্রশ্ন করিল, "বাজনদারেরা তোয়ের আছে?…দিক্, ঢাকে ঘা দিক্ এবার…"

কাঁসর, ঘন্টা আর ঢাকে ঘা পড়িল।

এমন সময় সিংহাসনশুদ্ধ জগন্নাথকে বুকের কাছে লইয়া, নামাবলী গায়ে একজন গৌরকান্তি বিধবা খুব সহজভাবে ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া বারান্দায় উঠিলেন, এবং একটু জলছিটা দিয়া, সিংহাসনটি রাখিয়া গম্ভীরভাবে তাহার সম্মুখে জপে বসিয়া গেলেন।

বাজনার আওয়াজ সঙ্গে সঙ্গেই থামিয়া গেল। তাহার অল্পক্ষণের মধ্যেই মানুষের ভিড়ও গেল, পাঁঠার কাৎরানিও গেল; মন্দিরের মধ্যে শুধু বিষ্ণু ভট্টাচার্যের পূজার মন্ত্রগুলা শোনা যাইতে লাগিল—খুব সংযত স্বর।

সন্ধ্যার সময় রাধারাণী যখন আরতির যোগাড় করিতে আসিল, দেখিল মন্দির ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। দরজায় ঘা দিল, ডাকাডাকি করিল; যখন কিছুতেই দুয়ার খুলিল না, নিতান্ত মনমরা হইয়া চুপিচুপি বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। ঝি, রাঁধুনী আহারের জন্য ডাকিতে আসিয়া ঝাঁঝ দেখিয়া মানে মানে সরিয়া পড়িল। কালীপদ অনেক সাধাসাধি করিল, সে নিজেও খাইবে না বলিয়া ভয় দেখাইল, কোন ফল না হওয়ায় ধীরে ধীরে উঠিয়া আহার করিয়া আসিয়া পাশটিতে শুইয়া পড়িল।

ঘুম আসিতে কালীপদর বোধ হয় রাত হইয়া থাকিবে, সকাল বেলা দিব্য ফোঁস্ ফোঁস করিয়া নিদ্রা দিতেছে,—"ওঠ, ওঠ, শীগ্‌গির ওঠ গো!"—বলিয়া তীব্র ঝাঁকানি দিয়া রাধারাণী তাহাকে ঠেলিয়া তুলিল। চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে কাৎ হইয়া কালীপদ প্রশ্ন করিল, "কেন?"

রাধারাণী ভীতকণ্ঠে বলিল, "ডাকাত পড়েছে যে!" তাহার পর কালীপদ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিতেই খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কালীপদ রাগিয়া বলিল, "বাব্বা, কি মেয়ে যে!—এখনও বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে।"

রাধারাণী হাসিতে দুলিয়া দুলিয়া বলিল, "যেমন ভীতু…"

কালীপদ রাগতভাবেই বলিল, "ভারি বীরপুরুষ আমার! ডাকাতদের ঠেকিও তারা হাজির হ'লে।"

রাধারাণী তাচ্ছিল্যের সহিত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "পারি না নাকি? —আহা, বড্ড শক্ত!…ওরা মেয়েদের কিছু বলে না মশাই, তাতে কালো

মেয়ে, তাতে আবার স্বপ্ন দেখেছি, মা কালী এসে নিজের গায়ের রং আবার খানিকটা মাখিয়ে দিয়ে গেলেন।...বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?" হাতটা কালীপদর মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "এই দেখ, যাইনি হয়ে আর এক পোঁছ কালো?"



'...আহা-হা!...মরে যাই!...'

তাহার পর স্বামীর গায়ে একটু ঢলিয়া কৃত্রিম করুণার স্বরে বলিল, "আহা হা—হা, একজনের কনে আরও কালো হয়ে গেল গো!...আহা—হা—হা, মরে যাই, মরে যাই!..."

কালীপদ বলিল, "হ'ল তো বয়েই গেল !···মা কালী মুণ্ডের পৌঁছ দিয়ে কি বললেন ? বললেন বুঝি—'ডাকিনী, যোগিনী হয়ে আমার সঙ্গে'..."

রাধারাণীর মুখ হঠাৎ কৌতুকচ্ছটায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল ; বলিল, "ঠিক কথা গো, স্বপ্নে আর একটা বড় মজা হয়েছে, বড্ড মজা ; কিন্তু যা ভীতু তুমি, বলাই বৃথা, শুনলেই ভির্মি যাবে। আমার যেন মনে হ'ল, মা কালী এসে বাবাকে মেঝে থেকে তুলে বললেন,—'ওঠ, আমি বাড়ি জুড়ে রয়েছি, ভয় কি ?' তারপর হাসতে হাসতে আমার কাছে এসে···চলো ফুল তুলতে তুলতে সব বলছি, চলো না···কালীঠাকুর আবার এত নকলও জানেন !—কি, আমি নিজেই ঘুমুতে পারিনি, শুয়ে শুয়ে এই সব তন্দ্রায় দেখেছি, কে জানে ? —বাবার জন্যে মনটা যা ছট্‌ফট্ করছিল...চলো, ওঠো, সব বলছি···"

অনেকক্ষণ ধরিয়া পুকুরধারের ধনুকপানা নারিকেল গাছটার গোড়ায় বসিয়া গল্প চলিল,—শুধু গল্পই নয়, কত সব জল্পনা-কল্পনা, মান-অভিমান, জেদাজেদি, এমন কি ছাড়াছাড়ি পর্যন্ত। শেষ নাগাদ কিন্তু আবার সব ঠিক হইয়া গেল ; সাজিভরা ফুল-বিল্বপত্র লইয়া গলাগলি হইয়া দু'জনে বাড়িমুখো হইল। মন্দিরের সিঁড়ির কাছে আসিয়া কালীপদ বলিল, "আমি তাহ'লে এক্ষুণি আসছি ; ভয় করলে···"

তাচ্ছিল্যের সহিত 'ইস্ !'—করিয়া রাধারাণী মন্দিরে ঢুকিয়া গেল।

অমাবস্যা তিথি। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বিষ্ণু ভট্টাচার্য মন্দির হইতে বাহির হইলেন। কি ভাবিলেন তিনিই জানেন—ধীরে ধীরে বাড়িতে গিয়া সমস্ত ঘর সমস্ত দেরাজ-সিন্দুকের তালাচাবি খুলিয়া আবার শান্তভাবে নামিয়া আসিয়া চাবির তাড়াটা প্রতিমার পদমূলে রাখিয়া দিলেন।

"বাবা ?"—বলিয়া রাধারাণী বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল, হাত তুলিয়া বারণ করিলেন। তাহার পর কি ভাবিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নিজেই বলিলেন, "আজ যে মা আসছেন, মা !" আবার পূজায় বসিলেন।

রাত্রি যখন প্রায় দুই প্রহর অতীত হইয়াছে, হঠাৎ চক্রবর্তীদের পাড়ায় প্রচণ্ড এক শব্দ উঠিল—"রে-রে-রে-রে-রে !···"

কালীপদ আর রাধারাণী পূজার কাছে বসিয়া ছিল ; কালীপদ একটু কাঁপা গলায় ডাকিল, "বাবা !"

উত্তর পাওয়া গেল না। বিষ্ণু ভট্টাচার্য অনেকক্ষণ হইতেই প্রলাপ বকিতেছিলেন, বুঝা গেল সংজ্ঞা নাই। কালীপদ রাধারাণীর মুখের পানে চাহিল।

রাধারাণী বলিল, "তোমার ভয় করছে নাকি?—বাবার মুখে শুনলে তো? ভয় করলে আমাদের বাড়িতে মা কালী আর আসবেন কোথা থেকে?"—বলিয়া বেশ সহজভাবেই হাসিয়া উঠিল।

ক্রমে কোলাহল আরও ভীষণ হইয়া উঠিল। ও পাড়ার গাছপালার মধ্যে পুঞ্জীভূত অন্ধকার মশালের আলোয় খণ্ডিত হইয়া গিয়া বিকশিত-দংষ্ট্রা দৈত্যের মতো বিকট হইয়া উঠিল।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে দলটা এ-মুখো হইল। ভৈরব সর্দার আগে আগে, পিছনে ধ্বংসোন্মত্ত প্রায় শতাবধি লোকের একটা দল। বাগানে প্রবেশ করিয়া সবাই সমস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল। ভৈরব বলিল, "থাম্ রে, এটা মায়ের বাড়ি।"

একজন রুক্ষস্বরে উত্তর করিল, "উপোসী মায়ের পূজো দিতে এসেছি, জানিয়ে আসবোনা?"—এই কথার উপর আর একটা উগ্রতর নিনাদ উঠিল।

দলটা আসিয়া মন্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল। মন্দির অভ্যন্তরস্থ দীপের স্তিমিত আলোকে দেখা গেল রক্তচেলি-পরা একটি গৌরকান্তি পুরুষ প্রতিমার সামনে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া আছে, অত শব্দের মধ্যেও নিস্পন্দ। সবাই ঠেলিয়া মন্দিরে উঠিতেছিল, ভৈরব পিছনের চাপে দুই পা অগ্রসর হইল, তাহার পর জমিতে শক্তভাবে পা পুঁতিয়া, দক্ষিণ হাতটা উঠাইয়া বলিল, "না, উঠতে দে; অসাড়ের রক্ত মা খায় না; জাগুক, ততক্ষণ ও দিকটা সেরে আসবি চল্ সব, কিছুর যেন চিহ্ন না থাকে..."

দলের নির্দিষ্ট একটা অংশ বাড়িটা ঘিরিয়া ফেলিল। গগন বিদীর্ণ করিয়া 'রে-রে' শব্দ, গ্রামের চতুঃসীমা হইতে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিতেছে। সে যুগে ডাকাতরা প্রথমে সমস্ত গ্রামটা ঘিরিয়া ফেলিত।

মন্দিরের পিছনে, কাঠাকয়েক জমির পরেই বাড়িটা। মশালের ধূম্রমলিন আলোয় দূর থেকেই দেখা গেল, কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নাই; পুরীর মুক্তদ্বার গৃহগুলার বাহিরে আলো পড়িয়া ভিতরকার অন্ধকারকে স্পষ্ট আর বীভৎস করিয়া তুলিল।

এ-ধরণের বিরোধহীন অবরোধে ভৈরব সর্দার অভ্যস্ত ছিল না। ডাকাতি করিতে আসিয়া যদি উভয় পক্ষেই দু'চারটা মাথা না পড়ে তো

তরোয়ালে আর সিঁধকাটিতে ব্যবধান থাকে কোথায়? পা তুলিয়া তাহার পা দুইটা যেন ভারালস বলিয়া বোধ হইল। নিশ্চল হইয়া একটু দাঁড়াইল, তাহার পর হঠাৎ জোর করিয়া আগাইয়া জোর করিয়াই রাগিয়া বলিল, "আর এগিয়ে, তোরা সব থমকে দাঁড়াস যে!"

অনায়াস লুণ্ঠন। বাড়িটা যেন মুক্তাঞ্জলিতে সমস্ত ধনসম্ভার লইয়া অপেক্ষাই করিতেছিল, শুধু লওয়ার দেরি। ভৈরব সর্দারের একটা অহেতুক অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। সে কি ভাবিল বলা যায় না, শুধু একটি মাত্র মশাল আর মাত্র জন পাঁচেক লোক সঙ্গে রাখিয়া বাকি সমস্তই বাহির করিয়া দিল। বোধ হয় ভাবিল, অন্ধকার বাড়িতে খুঁজিয়া-পাতিয়া আঘাত খাইয়া লুণ্ঠন করিলে তবুও বিরোধের একটু আস্বাদ পাওয়া যাইবে, তবুও ডাকাতির মর্যাদাটা কতকটা বজায় থাকিবে। মানুষের নিকট নিরাশ হইয়া সে যেন অন্ধকার বাড়িটাকে সজীব করিয়া তাহাকেই যুদ্ধে আহ্বান করিল।

সবচেয়ে ক্ষীণশিখ মশালটা লইল, নিজের হাতেই লইল। তাহার পর সেই অল্পসংখ্যক সঙ্গী লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এ-ঘর ও-ঘরের ভিতর দিয়া, ডালাখোলা বাক্স উজাড় করিয়া, বারান্দা দিয়া চলিয়া আসিতে একটা একটু প্রশস্ত জায়গা; তাহার পর সরু এক ফালি গলি, ধুয়ে আর ছ'টা লোকের বিকট ছায়ায় যেন ভরাট হইয়া গেল। কোনখানে একটু শব্দ নাই, আর্তনাদ নাই; নিস্তব্ধতার মধ্যেও যে স্তম্ভিত প্রাণের একটা পরিচয় সে পাইয়া আসিয়াছে এই প্রাণহীন পুরীতে সেটার অভাব তাহাকে পীড়িত করিতে লাগিল। এই অস্বাভাবিক অবস্থায় সর্দারের কেবলই মনে হইতে লাগিল, আজ মায়ের শ্মশানকালীর পায়ে জবাফুল দাঁড়ায় নাই, মা পূজা লন নাই।...মনকে শান্ত করিবার জন্য মনে মনে বলিল, "মা, তোমার পূজো আজ এইখানেই; তপ্তরক্তে পূজো চাই, তাই জবায় তুষ্ট হও নি। তুমি আজ শ্মশান ছেড়ে এসো, ভক্ত তোমার জন্যে আজ এইখানেই শ্মশান সৃষ্টি করে দেবে।"

ভৈরব কোমরে জড়ানো রক্তাম্বরের মধ্য হইতে একটা বোতল বাহির করিয়া তাহার মধ্যের তরল পদার্থ চক্‌চক্ করিয়া গলায় খানিকটা ঢালিয়া দিল,—কারণ-বারি। পরে চিত্তের দুর্বলতা জয় করিবার জন্যই হোক, বা যে জন্যই হোক, মশাল তুলিয়া একবার "জয় মা!" করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—পাঁচজনে যোগ দিল, উন্নত মশালের আলোর ছায়াগুলা যেন হঠাৎ চমকিত হইয়া উঠিল।